প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৭
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
শ্রীগণেশ বসু
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং
ও
মডার্ণ প্রসেস
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

অনুবাদকের লেখা :

অঙ্গুষ্ঠ (কবিতা)

একটি ধানের শীষের উপরে (জাপানী কবিতার অনুবাদ)

কার্ল স্যাণ্ডবার্গের একমুঠো (কবিতা)

হ্যামারাশোল্ডের কবিতা

সত্ত্বায় স্মৃতিতে (কবিতা)

হয়তো গোলাপ (কবিতা)

নতুন করে পাব বলে (স্মৃতি চিত্র)

আধুনিক বাংলা কবিতা ও দ্বন্দ্ববাদ (আলোচনা)

কালব্যাধি ক্যানসার (বিজ্ঞান)

বৈষ্ণব কাব্যে প্রেম (আলোচনা)

হিরোসিমা (জাপানী কবিতার অনুবাদ)

নির্বাচিত কবিতা (কবিতা)

কাওয়াবাতা ইয়াসুনারি

রবীন্দ্রনাথের পর সমগ্র এশিয়া মহাদেশে ইয়াসুনারী কাওয়াবাতা ১৯৫৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের এই সম্মান লাভে সমগ্র প্রাচ্য জগৎ গৌরবান্বিত।

জন্ম ১৮৯৯ সালে ওসাকা শহরে। তাঁর পিতা ছিলেন চিকিৎসক। অতি অল্প বয়সে তিনি বাবা, মাকে হারান। ছেলেবেলা থেকে তাঁর সাহিত্যানুরাগ।

ছাত্রাবস্থায় তিনি থাকতেন আসাকুসায়। সেই সময়কার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা "ইজু নর্তকী।"

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় তিনি প্রথমে ইংরাজি সাহিত্য ও তারপর জাপানী সাহিত্য পাঠ করেন।

১৯২৯ সালে তাঁর অনেক ছোট গল্প প্রকাশিত হয় ও তিনি একজন অসাধারণ গল্প লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সময়ে লেখা গল্পগুলি "পশু-পাখী" এই নামে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। তারপর পর বার হতে থাকে একে একে যে বইগুলি, তা তাঁকে জাপানী সাহিত্যে স্থায়ী গৌরবে অধিষ্ঠিত করে। এগুলির মধ্যে "বরফের দেশ" (১৯৩৭), "হাজার সারস" (১৯৪৯, "পাহাড়ের শব্দ" (১৯৪৯), পুনর্বিবাহ" (১৯৫৩), "টোকিওর লোক" (১৯৫৫), ও "হ্রদ" (১৯৫৫) সালে প্রকাশিত হয়।

জাপানী সাহিত্যেও যখন বর্তমানের অশ্লীলতার জোয়ার আসে, তখনও দেখা যায় অশ্লীল যৌন পটভূমির মধ্যেও তিনি রেখেছেন সুন্দরকে, প্রেমকে সর্ব ক্লেদমুক্ত। এই দিকটিই বিশেষ করে দেখা যাবে তাঁর বর্তমান বইখানিতে।

জাপানী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘকাল যোগাযোগ আছে। তাঁর অনুবাদ "একটি ধানের শীষের উপরে" অনবদ্য জাপানী হাইকু কবিতার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয়

করিয়ে দিয়েছে। তেমনি তাঁর অসাধারণ অনুবাদে "হিরোসিমা"র গভীর ট্রাজেডি পাঠকদের কাছে উন্মোচিত। কাওয়াবাতা নোবেল পুরস্কার পাবার দু'বছর আগে তিনিই প্রথম বাঙ্গালী পাঠকের কাছে কাওয়াবাতার দুটি গল্প প্রকাশ করে কাওয়াবাতার পরিচয় উন্মোচন করেন।

নোবেল পুরস্কার পাবার বছর দুইয়ের মধ্যে কাওয়াবাতা হারাকিরি করে আত্মহনন করেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্য দেশ বিদেশে অমর হয়ে রইল।

প্রকাশক



ইজু নর্তকী

সিডাব গাছগুলোর কাছ থেকে পাহাড়ের কিনারা ঘেষে, বৃষ্টিটা ক্রমে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। তখন আমাব বয়স হবে উনিশ। ইজু অন্তবীপ এলাকায় আমি একা বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাব পোশাকটা ছিল ছাত্ররা যেরকম পবে। রঙিন কিমনো, কাঠের উঁচু খড়ম, মাথায় স্কুলের টুপি। আব কাঁধের উপর একটা বইয়ের থলি। এইখানকার উষ্ণপ্রস্রবণ অঞ্চলে আমি তিন রাত কাটিয়েছি। চারদিন হল আমি টোকিওর বাইরে। ইজু অঞ্চলের আমাগি গিরিবর্ত্মের উপর দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, শরতের দৃশ্য অপূর্ব, একটার উপর একটা পাহাড় উঠে গিয়েছে, গভীর বন-ভূমি। কিন্তু এই প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেয়ে আমার আকর্ষণ ছিল

ভিন্ন। বলা যায় একটা আশা। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা, তখনি ঝরতে আরম্ভ করল, আমি ছুটতে শুরু করলাম। রাস্তাটা এঁকা-বেঁকা, চড়াইও খুব, শেষে পৌঁছলাম একটা সরাইখানায়। দরজায় পৌঁছলাম। বরাতটা ভালো। নাচের দল ভিতরে রয়েছে।

ছোট নর্তকী মেয়েটি আমার দিকে বসবার গদীটা ঠেলে দিল বিনীত ভাবে।

"বেশ" বোকার মতো আমি বললাম। আর কিছু বলার খুঁজে পেলাম না যেন।

ও আমার কাছে বসল মুখোমুখি। আমি ধূমপান করতে চাইলাম, সে ছাইদানিটা ঠেলে দিল আমার দিকে। তাতেও আমি কিছু বললাম না।

মেয়ের বয়স বছর ষোল। চুলগুলো পুরান ঢংয়ে বাঁধা, বাদামী গড়নের তার মুখখানা, যেন তাইতে ওকে আরও ছোট দেখাচ্ছিল। তবুও ওর চুল, মুখ সব বেশ মানিয়ে গিয়েছিল, যেন পুরান ছবির মতো। ওর সঙ্গে আরো দুটি তরুণী। আর লোকটির বয়স হবে চব্বিশ, পঁচিশ। বছর চল্লিশের এক বয়স্কা স্ত্রীলোক যেন দলের কর্ত্রী।

ছোট নর্তকীটিকে আমি এর আগে দুবার দেখেছি। একবার আর দুটি সঙ্গের তরুণীর সঙ্গে পোলের উপর দিয়ে যেতে। ওর হাতে ছিল একটা ঢাক। আমি বার বার তাকাচ্ছিলাম যেআমার যাত্রায় অন্তত কিছু রং লাগল। তারপর দেখেছিলাম ওর নাচ রাত্রে সরাইখানাতে। সরাইখানায় ঢোকার মুখটাতে নাচ হচ্ছিল। আর আমি তন্ময় হয়ে সিঁড়ির উপর বসে দেখছিলাম। তারপর আসবার পথে আমি ভাবছিলাম। সামনে এতটা পথ, এর মধ্যে নিশ্চয়

আবার দেখা হয়ে যাবে। হয়ত সেইজন্যই চড়াইয়ের পথে আমি এত তাড়াতাড়ি হাঁটছিলাম। কিন্তু সরাইখানায় হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াটা যেন আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল।

কিছুক্ষণ বাদে সরাইখানার বুড়ীটা আমাকে পাশের একটি ঘরে নিয়ে গেল। দেখলাম এ ঘরটা বেশী ব্যবহার হয় না। খোলা জানলা পাহাড়ের উতরায়ের উপর, তলা দেখা যায় না। আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল শীতে।

বুড়ী দেখে বললে, "এঃ, একেবারে ভিজে গিয়েছ দেখছি।" এই বলে আমাকে বসবার ঘরে নিয়ে গেল।

খোলা উনুন থেকে আমার গায়ে তাত লাগছিল। আমি আগুনের দিকে পিছন করে বসলাম। উত্তাপ এত বেশী যে আমার মাথা ধরে গেল।

সরাইখানার বুড়ী ও ঘরে গিয়ে কথা বলতে লাগল, "এই বাচ্ছা মেয়েটিই তোমার সঙ্গে ছিল আগের বার। কত বড় হয়ে গিয়েছে? আর ক'ভ্রকে স্ত্রী হয়েছে। মেয়েরা কি তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।

ঘণ্টাখানেক বাদে আমার মনে হল ওরা যেন যাবার তোড়জোড় করছে। আমার বুক যেন ধড়ফড় করে উঠল। কিন্তু তবু উঠে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবতে পারলাম না। বসে রইলাম আগুনের ধারে। কিন্তু মনে হল হাজার হোক, এতজন মেয়ে মানুষ! যদি হেঁটে যায়, কিছুদূর এগিয়ে গেলেও আমি ওদের ধরে ফেলতে পারব। "ওরা রাতে কোথায় থাকবে?"

সরাইখানার বুড়ী ফিরে আসতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"ওরকম লোকদের কি থাকার জায়গার কিছু ঠিক আছে? যেখানে পয়সা মিলবে। আগে থেকে তার ঠিক আছে না কি?"

ওর তাচ্ছিল্য যেন আমাকে উত্তেজিত করে তুলল। ভাবলাম, তাই যদি হয় তবে ওই মেয়েটা আজ রাতে আমার ঘরেই থাকবে। বৃষ্টি প্রায় ধরে এলো, আকাশও কিছুটা পরিষ্কার হল। আমার মনে হল ব্যস আর কি চাই? অবশ্য বুড়ী বললে আর একটু অপেক্ষা করলেই রোদ উঠবে।

"এ তো অনেক বেশী দিয়েছ। এত কিসের?" বুড়ি আমার পিছন পিছন এসে আমার থলিটা ধরল। "এত বেশী কেন দিয়েছ?" আমার মনে হল, মাত্র পঞ্চাশ সেণ্টের জন্য বেচারী এতটা কৃতজ্ঞ। আমার দরকার ওদের ধরা। তাই তাড়া। বুড়ীটা মিছে দেরি করে দিচ্ছে। আমি ওর হাত ছাড়িয়ে চলতে শুরু করলাম।



২



একদিকে সাদা বেড়া। রাস্তাটা বেঁকে গেছে একটা সুড়ঙ্গ পথের দিকে। যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের শেষ প্রান্তে ওই নর্তকী, আর তার সঙ্গীরা। আর আধমাইলের মধ্যে আমি ওদের ধরে ফেললাম। হঠাৎ ওদের মতোই গতিটা মন্থর করে দেওয়াটা খারাপ দেখাবে। তাই আমি হেঁটে যেন ওদের পার হয়েই গেলাম।

"তুমি তো খুব হাঁটতে পার। যাক বৃষ্টিটা যা হোক ধরল।" ওদের সঙ্গী পুরুষটি আমাকে বললে।

আমি তখন গতি মন্থর করে তার পাশে পাশেই হাঁটতে লাগলাম। সে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। আর মেয়েরা কথা-

বার্তা শুনতে শুনতে আসছিল পিছনে পিছনে। লোকটির কাঁধে একটা বড় পেঁটরা। বয়স্কা মেয়েমানুষটির হাতে একটা বাচ্চা কুকুর। অন্য দুটি মেয়েমানুষ বইছিল.পুঁটলি। আর তরুণীর হাতে ঢাকটা। ওরাও কথা বলছিল।

'ও স্কুলে পড়ে।' দুটি মেয়ের মধ্যে একজন তরুণীটিকে বলল। শুনে আমি পিছন ফিরে দেখি দুজনেই হাসছে।

"জানি। ছাত্ররা এদিকে খুব আসে।" মেয়েটি বললে।

ওদের বাড়ি ইজু দ্বীপের ওসিমায় লোকটি আমাকে বললে। ওরা এই উপদ্বীপ অঞ্চলে ঘুরতে বার হয়েছিল। শীত পড়ে আসছে। ওদের সঙ্গে গরম জামা কাপড় নেই। তাই ওরা যাচ্ছে দক্ষিণে সিমোদাতে। সেখান থেকে ওরা পাড়ি দেবে ওদের দ্বীপে। আমি আর একবার তাকালাম, মেয়েটির দিকে। যেন আরও সুন্দরী মনে হল, ওসিমায় ওদের বাড়ি শুনে, ওসিমার নানা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম।

"ছাত্ররা ওসিমাতে সাঁতার কাটতে আসে।" তরুণীটি তার সঙ্গিনীকে বললে।

"গরমের সময় নিশ্চয়।" আমি পিছন ফিরে বললাম।

একটু ইতস্তত করে ও উত্তর দিল, "না শীতের সময়েও।"

"শীতেও?"

উগানোর ছ সাত মাইল উপর থেকে রাস্তাটা চলেছে নদীর সঙ্গে সঙ্গে। নামবার সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড়ের চেহারাটাও যেন দক্ষিণের মতো হয়ে উঠল। লোকটির সঙ্গে তখন আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। আমি বললাম, ওদের সঙ্গে সিমোদা যাবার ইচ্ছা আমারও। ও তো তাতে খুব খুশী।

একটি পুরান সরাইখানার সামনে বরাবর এসে বয়স্কা স্ত্রীলোকটি আমার দিকে তাকাল, যেন বিদায় সম্ভাষণ জানাতেই। কিন্তু লোকটি বললে, ভদ্রলোক তো আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছেন।

"তাই নাকি? সেই কথায় বলে না, পথে সঙ্গী আর জীবনে দরদ, ভালোই হল। আমাদের সঙ্গে ভিতরে এসো। একটু চা খাওয়া যাবে।"

আমরা দোতলায় গিয়ে আমাদের মালপত্রগুলো রাখলাম। ঘরে খড়ের কার্পেট পাতা। সেটা পুরান। ছেঁড়াও। ছোট মেয়েটি নিচে থেকে চা নিয়ে এলো, আমার কাছে যখন নিয়ে এলো, প্লেটের উপর কাপটা চলকে একটু চা পড়ে গেল। বেচারী ঘাবড়ে গেছে। আমিও আবার এতটার জন্য তৈরি ছিলাম না।

মেয়েটি একটা কাপড় দিয়ে খুব অনেকক্ষণ ধরে জায়গাটা মুছতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাটাক পরে লোকটি আমাকে আর একটা সরাইখানায় নিয়ে এলো। আমি ভেবেছিলাম ওদের সঙ্গেই থাকব, এজায়গাটা ওখান থেকে শ'খানেক গজ দূরে। নদীটার ধারে একটা উষ্ণ প্রস্রবণ, তার উপরে একটা পোল, যা দিয়ে সরাইখানায় যেতে হয়।

আমরা দুজনে স্নান করতে গেলাম। ওর বয়স তেইশ। ও আরো বললে, যে ওর স্ত্রীর দুবার গর্ভপাত হয়ে গিয়েছে। কথাবার্তায় খুব চালাক বলে মনে হল না। আমি ভাবলাম ও আমারই মতো বেড়াতে এসেছে, হয়ত আমারই মতো ওই নর্তকীদের সঙ্গে থাকতে চায়।

সন্ধ্যার আগেই বৃষ্টিটা চেপে এলো। পাহাড়গুলো হয়ে উঠল

কাগজে আঁকা ছবির মতো চেপটা আর নদীটা হয়ে উঠল হলদে। বুঝলাম নর্তকীরা এ রকম দুর্যোগের রাতে কোথাও বার হবে না। তবু যেন আমি স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলাম না। দুতিনবার আমি বাইরে গেলাম, ঘরে চুপ করে বসে থাকতে পারছিলাম না।

বৃষ্টির মধ্যে দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের শব্দ কানে আসতে লাগল।

জানলাটা খুলে আমি বাইরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। শব্দটা কাছে আসতে লাগল। আমার মাথায় জলের ছাট লাগছিল। চোখ বুজে আমি শব্দটার দিকে ভালো করে মন দেবার চেষ্টা করছিলাম। মাঝে মাঝে যেন একটা মহিলাকণ্ঠ। কেউ কাউকে ডাকছে, আর হাসির শব্দও। মনে হল, ওদের সরাইখানার সামনে রেস্তোরাঁতে বোধহয় ওরা নাচ গান করছে। তিন চারটি মহিলা কণ্ঠ ও পুরুষকণ্ঠও তিন চারটি, আমি আলাদা আলাদা করে বুঝতে পারছিলাম। আমি নিজেকে বললাম, শেষ হয়ে গেলে ওরা নিশ্চয় এখানেই আসবে। ওখানের জলসায় বেশ আনন্দ বেশ হৈ চৈ চলছিল বলে মনে হল। চাবুকের মতো একটা মহিলা কণ্ঠ যেন অন্ধকারের মধ্যে শোনা যাচ্ছিল। জানলার উপরে বসে ঢাকের প্রত্যেকটি আওয়াজে যেন আমার কতকটা আশ্বস্ত বোধ হচ্ছিল, আর তার মাঝের নিঃশব্দতা যেন অসহ্য বোধ হচ্ছিল।

এলোমেলো পায়ের আওয়াজও যেন পাওয়া যাচ্ছিল। তবে কি ওরা নাচছে? আবার একেবারে নিঃশব্দ, কে জানে ও কি করছে। কার সঙ্গে আজ রাত কাটাবে, কে জানে?

জানলা বন্ধ করে বিছানায় গেলাম। কিন্তু বুকে একটা যেন চাপ।

আবার স্নান করলাম। বৃষ্টি ধরে চাঁদ উঠেছে, ধোঁয়াটে শরতের আকাশ। যেন স্ফটিক স্বচ্ছ আর সব। ভাবলাম খালি পায়ে একবার দেখে আসি ও কি করছে। রাত তখন দুটো।



৩



লোকটি পরদিন সকাল নটা নাগাদ আমার ঘরে এলো। আমি সেইমাত্র উঠেছি, একসঙ্গে আমরা স্নান করতে গেলাম। বৃষ্টির পরে নদীর ধারা উদ্বেল হয়ে বয়ে চলেছে। গত রাত্রের উদ্বেগ অনেকটা শান্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার জানার কৌতূহল হচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করলাম, "গত রাতের জলসা খুব জমেছিল ? না ?"

"তুমি শুনতে পেয়েছিলে ?"

"নিশ্চয়।"

"গাঁয়ের লোক তো ; ওদের হৈ চৈ-টা বেশী। আসলে এমন কিছু নয়।"

ওর কাছে যেন এ সব রুটিনের মধ্যেই। আমিও ওকে আর কিছু

বললাম না।

"দেখওরাওনদীর ওধারে স্নান করতে এসেছে। আমাদের দেখে নি। দেখ ওরা হাসছে।" ও পারের সাধারণ স্নানের জায়গাটার দিকে ও আঙুল দেখাল। বাষ্পের স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে ছ সাতটি নগ্ন মূর্তি দেখা গেল।

একটি ছোট মূর্তি, দৌড়ে এসে পাটাতনে রৌদ্রে দাঁড়াল। তারপর হাত তুলে যেন আমাদের কি বলছে মনে হল। কি হয়ত নদীতে সাঁতার কাটবার জন্যই। সেই ছোট নর্তকী। তার খোদাই করা, সুন্দর, নগ্ন দেহের দিকে আমি তাকালাম। আমার মনটাও যেন পরিষ্কার জলে ধুয়ে গেল। আমি হাসলাম, মেয়েটা নেহাৎ শিশু। পরিচিত লোক দেখে আনন্দের আতিশয্যে নগ্ন দেহে ছুটে আসতেও ওর একটুও লজ্জা হয় নি। অপাপবিদ্ধ। এক পুরু ধুলো যেন আমার মাথার মধ্যে থেকে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে মনে হাসলাম। হয়ত ওর ওই চমৎকার চুলগুলো, আর ওর পোশাক, তাইতেই আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটা যুবতী। ভুল! মারাত্মক ভুল করেছিলাম।

আমরা ফিরলাম আমার ঘরেই। দুই তরুণীর মধ্যে যে বড়, সে এলো বাগানে, ফুল দেখতে। ছোট নর্তকী কিছুদূর এলো পিছনে। বর্ষিয়সী যেন কপাল কোঁচকালেন। ছোট নর্তকী কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ফিরে গেল, তরুণী নর্তকী পোলের কাছ অবধি গেল।

"এসো না!" আমাকে সে বললে।

"এদিকে এসো" ছোট নর্তকীর গলা শুনলাম। ওরা দু'জনেই ফিরল সরাইখানার দিকে।

লোকটি সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার ঘরে রইল।

যে রাতে বাজনার আওয়াজ শোনা গেল, সেই রাতে আমি এক-জন সেলসম্যানের সঙ্গে দাবা খেলছিলাম। আমি উঠে বারান্দায় গেলাম।

"আর এক দান খেললে হয়", লোকটি আমায় বললে। ফিকে হাসি হাসলাম, এড়াবার জন্য। সেও আর চেষ্টা করল না।

ছোট তরুণী আর লোকটি ঘরে এলো।

"আজ কোথায় যাবার আছে নাকি ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কই আর ?"

মাঝ রাত পর্যন্ত ওদের সঙ্গে চেকারস খেললাম।

জানতাম আমি ঘুমতে পারব না, দালান থেকে সেলসম্যানটিকে ডাকলাম।

"বেশ বেশ।" ও যেন লড়ায়ের জন্য তৈরি।

"আজ সারারাত খেলা যাবে।" নিজেকে আমার যেন অজেয় মনে হতে লাগল।

পরের দিন সকাল আটটায় আমাদের উগানো ছাড়বার কথা। স্কুলের টুপিটা থলিতে ঢুকিয়ে, আমি আর একটা টুপি পরলাম। ওদের সরাইখানায় গিয়ে দোতলায় উঠে দেখি, ওদের কারুর ঘুম ভাঙে নি।

ছোট মেয়েটা প্রায় আমার পায়ের কাছে শুয়ে। তার পাশে কমবয়সী তরুণীটি। তার মুখে গতরাতের প্রসাধনের চিহ্ন। ওর দিকে তাকিয়ে আমার ভালো লাগল। জেগে উঠে দু হাতে মুখ ঢেকে ও নিচু হয়ে আমাকে নমস্কার জানাল। তরুণীদের মধ্যে যেটি বড় আর লোকটি তার পাশাপাশি ঘুমচ্ছিল। ওরা স্বামী-স্ত্রী। এ কথাটা আমি আগে ভাবি নি।

"আমাদের ক্ষমা করো। ঠিক ছিল আজই যাবার। কিন্তু আজ একটা জলসা আছে। তোমার যদি তাড়া থাকে, তা হলে আবার সিমোদায় দেখা হবে, আমরা কোশুয়া সরাইখানায় থাকি।" বর্ষিয়সী বললে।

আমার উদাস বোধ হতে লাগল।

লোকটি কিন্তু বললে, "আজ থেকেই যাও না।"

"খুবই ভালো হয়।" স্ত্রীলোকটিও বললে। "কালতো আমরা যাবই।

পরশু বাচ্ছাটার মারা যাবার উনপঞ্চাশ দিন হবে, সিমোদায় গিয়ে আমরা ওর জন্য পূজা দেব। তুমিও যদি আমাদের সঙ্গে যাও,' বাচ্ছাটার কথা এত মনে পড়ে! চল না আমাদের সঙ্গে। পথে আর কজন বন্ধু পাওয়া যায়?"

আর একদিন থাকতে রাজি হয়ে গেলাম। আমরা সরাইখানার ম্যানেজারের ছোট নোংরা ঘরটায় বসে অপেক্ষা করছিলাম, ওরা তার মধ্যে তৈরি হয়ে নিক। লোকটি কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল। ওর সঙ্গে কাছাকাছি একটা মনোরম পোলের উপর দাঁড়িয়ে ওর নিজের কথা বলছিল, অনেকদিন ও থিয়েটারে কাজ করেছে টোকিওতে। ওসিমাতে অভিনয় করেছে। জলসায় দরকার হলে, বড় অভিনেতাদের অনুকরণ করে ও দেখায়। স্টেজের একটা তরোয়ালও আছে ওদের পুঁটলিতে। আর ট্রাঙ্কটায় আছে সাংসারিক জিনিসপত্র ও পোশাক।

"ভুল করে নিজের জীবনটা নষ্ট করেছি। আমার ভাই কোফুতে আছে। সে-ই বাড়ির দেখাশোনা করে।"

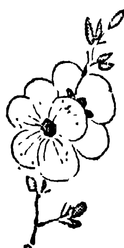
"আমি ভেবেছিলাম তুমি নাগাওকার লোক।"

"না। বড় তরুণীটি আমার স্ত্রী। বাচ্ছাটা সাতদিনের হয়ে মারা গেল। বৃদ্ধা আমার শাশুড়ি। ছোট মেয়েটি আমার বোন।"

"তুমি বলছিলে না, ওর বয়স তের?"

"হ্যাঁ। ওকে এ পেশার বাইরে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নানা কারণে তা হল কই?"

বললে ওর নাম এইকিচি। বোনের নাম কাওরু। অন্য তরুণীটি পরিচারিকার মতো, ওর বয়স ষোল। ওর বাড়ি ওসিমায়। ইকিচি নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখে জল।



৪



ফেরার পথে আবার দেখলাম ছোট নর্তকীকে। একটা কুকুরকে আদর করছে।

"সরাইখানায় এসো না।" আমি ওকে ডাকলাম।

"একা যাব কি করে?"

"তোমার দাদাকে নিয়ে এসো।"

"আচ্ছা।"

একটু বাদেই এইকিচি এলো।

"ওরা সব কোথায়?"

মা ওদের আসতে দিল না, কিন্তু একটু বাদেই পায়ের শব্দ, ওরা এসে হাজির। আমরা চেকার খেলছিলাম ওরা যেন একটু

ইতস্তত করে দাঁড়াল।

চিয়োকে ঢুকল প্রথমে। "এসো দাঁড়িয়ে রইলে কেন?" বললে। ঘণ্টাখানেক বাদে ওরা চান করতে গেল, আমাকেও যাবার জন্য ওরা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু তিনজন তরুণীর সঙ্গে এক-সঙ্গে স্নান করতে যাওয়ায়, আমার একটু ইতস্তত বোধ হতে লাগল। আমি পরে যাব বললাম।

"চিয়োকো তোমার পিঠটা ধুয়ে দেবেখন তুমি যদি এখনই আস।"

চিয়োকো আমার কাছে থেকে গেল, আমরা চেকারস খেলতে লাগলাম। ওখেলে খুব ভালো আমি প্রায় হেরেই যাচ্ছিলাম, ও তন্ময় হয়ে খেলছিল। ঝুঁকে পড়ে। ওর ঘন চুল প্রায় আমার বুকে লাগছিল যেন। হঠাৎ ও যেন লাল হয়ে উঠল।

"আমাকে এর জন্য বকুনি খেতে হবে।" খেলা শেষ না করেই ও উঠে পড়ল। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি তখন স্নানের জন্য নদীর উপর দাঁড়িয়েছিল।

এইকিচি প্রায় সারাটা দিনই আমার সরাইখানাতে কাটাল। সরাইখানার ম্যানেজারের স্ত্রী আমাকে অবশ্য ইশারায় জানাচ্ছিলেন যে এ রকম লোককে নিমন্ত্রণ করা মানে, শুধু পয়সা নষ্ট।

ও সরাইখানায় যখন গেলাম, তখন মেয়েটা সামিসেন বাজাচ্ছিল। আমায় দেখে ও থামল, কিন্তু বৃদ্ধার কথায় আবার বাজাতে শুরু করল। খাবার ঘরে এইকিচি অনেক লোকের সামনে যেন কি আবৃত্তি করছিল।

"ওখানে কি হচ্ছে?"

"নো নাটকের মহড়া।"

"তাই না কি ?"

"হাঁ, ও যে কখন কি করবে তা বলা শক্ত।"

মেয়েটি সলজ্জভাবে একখানা গল্পের বই আমার হাতে দিয়ে, আমায় পড়তে বললে। আমিও খুশী হলাম। ওর মাথাটা আমার কাঁধের কাছে। তন্ময় হয়ে ও শুনছে, বড় বড় চোখগুলো খোলা। যেন পলক পড়ছে না, তার উপরে কাল ভুরু। হাসিটাও যেন ফুলের মতো। কথাটাও ওর হাসির বর্ণনায় যেন সঠিক মানিয়ে যায়।

মাত্র কয়েক মিনিট পড়েছি। সরাইখানার ঝি এলো।

"আমি এখুনি আসছি। এসে বাকিটা শুনব।" এই বলে ও উঠে পড়ল।

পাশের ঘরে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ও হাঁটু গেড়ে ঢাকটার কাছে বসল। ঘন্টাখানেক বাদে ওরা চারজনেই এলো।

"এই পাওয়া গেল।" হাতটা খুলে ও পঞ্চাশ সেন্ট দেখাল, সেটা বয়স্কা মহিলাকে দিয়ে গল্প শুনতে লাগল। ওরা সেই মরা ছেলেটার কথা বলতে শুরু করল।

ওদের সম্পর্কে আমার কৌতূহলের আকর্ষণ কমে গিয়েছিল। ওরা পথে-ঘাটে নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। কিন্তু তার জন্য ওদের সম্পর্কে আমার কোনো বিতৃষ্ণা ছিল না। ওরা আমাকে ওসিমা যেতে বললে। এমনকি কোথায় আমায় থাকতে দেবে, তাও ঠিক করে ফেলল।

"আমাদের দুটো বাড়ি আছে। পাহাড়ের উপরেরটায় তুমি থাকবে।"

এও ঠিক হয়ে গেল, ওসিমায় গিয়ে নতুন বছরে যে থিয়েটার হবে, আমাকে তাতেও সাহায্য করতে হবে।

আমারও মনে হল, বেশ এদের জীবন, ভাবনা চিন্তা নেই। সহজ সরল জীবন। তবু কত গভীর। পারিবারিক বন্ধন, ভালোবাসা, সবই। ওদের পরিচারিকা উরিকো, বোধহয় ওর বয়সের জন্যই, একটু আড়ষ্ট বোধ করছিল।

প্রায় মাঝ রাত করে উঠলাম। ওরা আমাকে এগিয়ে দিল। মেয়েটা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, "উঠেছে। কাল আমরা সিমোদায় যাব। আমার সিমোদা খুব ভালো লাগে। মা আমাকে একখানা চিরুনী কিনে দেবে। ওখানে সিনেমা দেখব। আমায় সিনেমায় নিয়ে যাবে ?"

এই অঞ্চলে যারা ঘুরে বেড়ায় সিমোদা তাদের কাছে প্রিয়।



৫



আমরা আমাগি গিরিবর্ত্মের মাঝ দিয়ে চলার সময়ে, মালপত্রগুলো ভাগ করে নিলাম। কুকুর ছানাটাও যেন পেশাদার পরিব্রাজক। বৃদ্ধা মহিলার কোলে চড়ে নিঃশব্দে পথ চলেছে। উগানো থেকে আবার পাহাড়ে রাস্তা।

"ওই কি ওসিমা ?"

"তুমি তা হলে সত্যি যাচ্ছ?" ছোট নর্তকী জিজ্ঞাসা করল। সে গান করতে করতে আসলে পদক্ষেপে চলেছে।

রাস্তাটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, একটা রাস্তায় পথ কম। কিন্তু চড়াই। আমি সেটাই ধরলাম।

চড়াইটা এত বেশী, যে মনে হয় দেয়ালের উপর উঠছি। ঝরা

পাতায় তার উপর আবার পথটা পিছলও। যতই হাঁফ ধরতে লাগল, ততই আমি মরিয়া হয়ে হাঁটু চেপে উঠতে লাগলাম। আর সকলে পড়ে রইল অনেকটা পিছনে। মেয়েটি ছোট ছোট পা ফেলে আমার কাছাকাছি উঠে আসছিল। মাঝে মাঝে আমার দুটো একটা কথার জবাবও দিচ্ছিল। কথা বলার সময় আমি মাঝে মাঝে থামছিলাম ও উঠে আসুক। কিন্তু ও দূরত্বটা সমান রেখে ঠিক থেমে যাচ্ছিল। রাস্তা আরও খাড়া হয়ে উঠল। আমি আরো তাড়াতাড়ি চলার চেষ্টা করছিলাম। সেও কিন্তু প্রায় গজ দুয়েক দূরত্ব বজায় রেখে উঠছিল। পাহাড় নিস্তব্ধ। পিছনের লোকেদের আর সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না।

"তুমি টোকিওতে কোথায় থাক ?"

"হোস্টেলে। অবশ্য ঠিক টোকিও বলা উচিত নয়।"

"আমিও টোকিওতে গেছি। একবার নাচতে। তখন চেরি ফোটার সময়। আমি তখন ছোট। ভালো করে মনে নেই।"

"তোমার বাবা মা আছেন ?" আবার জিজ্ঞাসা করল। আরও অনেক কথা। সিমোদার সিনেমা ; মরা বাচ্ছাটা।

আমরা চূড়ায় উঠলাম। ঢাকটা একটা ঝরা পাতায় ঢাকা, বেঞ্চিতে রেখে ও রুমাল দিয়ে মুখটা মুছল। তারপর আমার কিমনোর ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগল। তারপর পায়ের উপরে ওর কিমনোটা উঁচু করা ছিল, সেটা নামিয়ে দিল, নিজে বসে আমাকেও বসতে বলল।

ছোট ছোট পাখী পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। শুকনো পাতা ঝরলে তার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। চারদিক নিস্তব্ধ। আঙুল দিয়ে ঢাকটায় আওয়াজ করলাম সামান্য, পাখীগুলো পালাল।

"তেষ্টা পেয়েছে।"

"দেখি যদি জল পাই।" কিন্তু কয়েক মিনিট বাদে ফিরে এলো, খালি হাত।

"তুমি ওসিমায় কি কর?"

ও কয়েকটি মেয়ের নাম করল। যাদের সঙ্গে ও স্কুলে পড়েছে। তাদের কথা কিছু কিছু। কতকটা নিজের স্মৃতি রোমন্থন। কিন্তু তার গল্পটা গুছিয়ে বলতে পারল না।

এইকিচির সঙ্গে অন্য দু'জন মহিলাও উপরে উঠে এলো। ওদের আসার মিনিট দশেক বাদে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাও এলো।

নামবার সময় আমি আর এইকিচি পিছনে রইলাম। বেশ খানিক-দূর নামার পর ছোট নর্তকী আবার আমাদের কাছে উঠে এলো।

"নিচে একটা ঝরণা আছে। ওরা অপেক্ষা করছে, তুমি আগে জল খাবে বলে।"

আমি ছুটে গেলাম। পাথরের পাশ দিয়ে পরিষ্কার জল বার হয়ে আসছে। "তুমি আগে খাও।"

আমি আগে জল খেলাম। মেয়েরা ঘাম মুছে, রুমালগুলো ভিজিয়ে নিল।

নিচে নেমেই আমরা সিমোদার রাস্তা পেলাম। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে দেখা যায় ধোঁয়া। লোকে কাঠকয়লা বানাচ্ছে। ছোট নর্তকী চিরুনী দিয়ে কুকুরের লোম আঁচড়াচ্ছিল।

"দাড়া ভেঙে যাবে।" বৃদ্ধা বললে।

"তা যাক সিমোদায় গিয়ে ত একটা নতুন কেনা হবে।"

এই চিরুনীখানা ওর মাথায় ছিল। আমি ভেবেছিলাম, সিমোদায় গিয়ে ওখানা চেয়ে নেব কিন্তু কুকুরের লোম আঁচড়ান দেখে

আমার খারাপ লাগল।

"দাঁতটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিলেই বেশ দেখাবে।" পিছন ফিরে তাকিয়ে বুঝলাম, আমার ভাঙা দাঁতটা নিয়ে ওদের কথা হচ্ছে। কথাটা আবার চাপা পড়ে গেল।

"বেশ ভালো ? নয় ?"

বুঝলাম আবার আমার কথাই। মনের কথার সরল অভিব্যক্তি। পাহাড়গুলোর দিকে তাকালাম। এত জ্বলজ্বল করছে যে যেন চোখে লাগে। উনিশ বছরের জীবনেই যেন আমার পৃথিবী সম্পর্কে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। আমি ছিলাম একা। হতাশাটা কাটিয়ে ওঠার জন্যই আমার বার হওয়া। কথাটা শুনে আমার মনে হল, কে জানে হয়ত আমি ভালো। পাহাড়ের রং যেন আরও পরিষ্কার হয়ে উঠল। আমরা সমুদ্র ও সিমোদার কাছাকাছি এসে গেলাম।

মাঝে মাঝে গাঁয়েতে দেখা যাচ্ছিল— ভবঘুরে নাচিয়েদের জায়গা নেই। সিমোদার উত্তরাঞ্চলে কোসুইয়া বলে একটা সরাই ছিল, বেশ সস্তা। তার দোতলায় আমরা গেলাম। ঘরের চালটা এক এক জায়গায় এত নিচু যে বসা যায় না। জানলাটাও ছোট।

"তোমাদের গায়ে হাতে ব্যথা হয় নি তো ?" বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করল মেয়েদের।

"না মোটেই নয়।" ছোট নর্তকী উত্তর দিল।

আমি ঢাকটা তুলে দেখলাম। "বেশ ভারী।"

"তোমার ব্যাগের চেয়ে অনেক ভারী।"

সিমোদায় ভবঘুরে নাচিয়েদের অনেকে আসে।

"আমায় সিনেমায় নিয়ে যাবে ত ?" ও যেন নিজের মনেই বলল।

আমি আর এইকিচি একসঙ্গে। আমাদের সঙ্গে জুটল একজন গুণ্ডা গোছের লোক। ওঠা গেল এক হোটেলে। সেটা নাকি এক প্রাক্তন মেয়রের হোটেল। স্নান করে, খাওয়া হল সমুদ্রের টাটকা মাছ।

যাবার সময় আমি ওকে কিছু টাকা দিয়ে বললাম, "কালকের অনুষ্ঠানের জন্য কিছু ফুল কিনে নিও।" আমাকে সকালের স্টিমারে টোকিও ফিরে যেতে হবে, তাও বললাম। আমার টাকা ফুরিয়ে এসেছিল। কিন্তু ওকে বললাম, স্কুলের তাড়া।

"আবার এই শীতে দেখা হবে।" বৃদ্ধা বললে। "এবার আমাদের লিখবে, কবে আসছ। থাকবেও আমাদের কাছে। আমরা থাকতে হোটেলে কেন থাকবে?"

ওরা তুলে দিতে আসব বললে। আর সকলে চলে গেলে চিয়োকো আর উরিকোকে বললাম আমার সঙ্গে সিনেমায় যাবার জন্য। চিয়োকো বললে, "আমি আর হাঁটতে পারব না।" উরিকো মাথা নিচু করে রইল।

আমি নিচে যাবার পর ছোট নর্তকী আমার সঙ্গে সিনেমা যাবার অনুমতি নিতে বড়দের কাছে গেল। কিন্তু অনুমতি মিলল না। অবশ্য এইকিচি বললে, "কেন তাতে কি হয়েছে?"

আমি যখন বার হচ্ছি, তখন ও দেখি কুকুরটাকে আদর করছে। আমার দিকে চেয়ে দেখতে ও যেন ইতস্তত করছে।

একাই গেলাম সিনেমায়। শেষ হতে আমার ঘরে গিয়ে অন্ধকারে শহরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জানি না কেন চোখে জল এলো।





পরদিন সকাল তখন সাতটা। প্রাতরাশে বসেছি, এইকিচি এলো। ভালো কিমনো ওর পরনে বুঝলাম আমার জন্য। মহিলারা সঙ্গে ছিল না, নিজেকে কেমন একা মনে হল।

“ওদের সবার আসার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কাল অনেক রাত হয়েছে শুতে। ওরা উঠতে পারল না। ওরা মাফ চেয়েছে। বলেছে শীত-কালে এসো।”

জাহাজ ঘাটে যাবার পথে, ও আমাকে তামাক আর কিছু ফল এনে দিল। আর একটা সেন্ট, যার নাম কায়েরু (ফেরা) “এই নামটার জন্য” ও হেসে বললে। আমার টুপিটা ওর মাথায় পরিয়ে দিয়ে বললাম, “এটা তোমাকে দিলাম।” দু'জনেই হাসলাম।

ঘাটের কাছে পোঁছে যেন আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল। ছোট নর্তকী জলের ধারে বসে আছে। আমরা কাছে এলেও ও নড়ল না। শুধু মাথাটা একটু হেলাল। ওর মুখখানা একটু লাল। চোখগুলোও। তবু যেন একটা সমাহিত মর্যাদায় ভরপূর।

"ওরা আসছে না?" এইকিচি জিজ্ঞাসা করল।

"ওরা এখনো ওঠে নি।"

এইকিচি জাহাজের টিকিট কিনতে গেল। আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বেশীরভাগ কথারই উত্তর না দিয়ে ও হয়ত জলের দিকে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে একটু ঘাড় নাড়ল।

আমি জাহাজের দড়ির সিঁড়ির উপরে ওঠবার সময় নর্তকীর দিকে তাকালাম। দাঁতে ঠোঁট চেপে ও দাঁড়িয়ে আছে। এইকিচি টুপিটা নাড়ল। ক্রমে শহরটা দূরে সরে যেতে লাগল। তখন মনে হল, মেয়েটা যেন সাদা কি একটা নাড়ছে।

আমি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ক্রমশ ইজু উপদ্বীপের শেষ প্রান্তটুকুও অদৃশ্য হয়ে গেল, ঘরে ফিরে গেলাম। সমুদ্র উত্তাল। বসে থাকা যায় না, শুয়ে পড়লাম। যেন সময়ের কথা ভুলে গেলাম। চোখের জলে বালিশ ভিজে গেল।

আমার পাশে আর একটি ছেলে শুয়ে ছিল সেও টোকিও যাচ্ছে। স্কুলে ভর্তি হবার পরীক্ষা দেবে। জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে?"

"একজনকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি।" গোপন করলাম না।

অন্ধকার হল। সমুদ্রের গন্ধ। ছেলেটির সান্নিধ্যের উত্তাপে আমার অশ্রু আর অবরোধ মানল না। সারা মাথাটা যেন পরিষ্কার জল হয়ে, ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে পড়ছে। এখনি আর কিছুই থাকবে না।

প্রসুপ্ত রূপসী



অশালীন কোনো কিছু করা চলবে না। সরাইখানার মহিলাটি এগুচিকে সাবধান করে দিলে। ঘুমন্ত মেয়েটির মুখের ভিতর হাত দেওয়া চলবে না ; কিংবা ওরকম কোনো কিছুই বারণ।

চৌকো ঘরটা লম্বা ও চওড়ায় গজ চারেক হবে। পাশে আর একখানা ঘর, উপর তলায় আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। নিচেও জায়গা অভ্যাগতদের থাকার মতো নয় ; কাজেই ঠিক সরাইখানা বলা যায় না। জায়গাটার একটা গোপনীয়তা আছে, তাই বাইরের গেটে কিছু লেখা নেই, চারিদিক নিস্তব্ধ। তালা-বন্ধ গেট দিয়ে ঢোকবার সময় এগুচি একটি মহিলাকেই দেখতে পেলে, তার সঙ্গে সে কথা বলছিল।

এখানে এই তার প্রথম আসা। মহিলাটিই এখানের কর্ত্রী না কর্মচারিণী তা জিজ্ঞাসা না করেছি ভালো।

চল্লিশের উপরই বয়স হবে। তবে গলা শুনে আরো কম মনে হয়। হাবভাবে যেনবেশ একটা কষ্টার্জিত প্রশান্তি, পাতলা ঠোঁট। কিন্তু কথা বলার সময়েও খোলে কম। এগুচির দিকে বিশেষ তাকাচ্ছিল না।

লোহার কেটলিতে চা তৈরি করছিল। সমগ্র পরিস্থিতির তুলনায় চা-টা ছিল আশ্চর্যরকমের ভালো। তাইতেই যেন বৃদ্ধ এগুচির মনেও একটা প্রশান্তি এনে দিলে। দেয়ালে শিল্পী কাওয়াই গায়োকুদোর গ্রাম্য শরৎকালের ছবির প্রতিলিপি। জায়গাটায় যে কোনো গোপনীয়তা আছে তা মনে হয় না।

"আর ওকে জাগাবার চেষ্টা করবেন না। অবশ্য করলেও যে জাগাতে পারবেন তা নয়।" একটু থেমে মহিলাটি আবার বললে, "মেয়েটিকে হাজার জাগাবার চেষ্টা করলেও ও জাগবে না। সে জানতেই পারবে না কে ওর কাছে এসেছিল।"

এগুচির মনে যে সন্দেহ জমা হচ্ছিল সে তা প্রকাশ করলে না।

"মেয়েটি সুন্দরী। আমি এমন লোকেদেরই অতিথি হিসেবে নিই যাদের বিশ্বাস করতে পারি।

হঠাৎ নিজের হাতের ঘড়িটার দিকে এগুচির নজর পড়ল।

"কটা বাজল?"

"পৌনে এগারো।"

"বুড়ো মানুষরা সকাল সকাল ঘুমুতে যায়। আবার ওঠেও সকাল সকাল।"

মহিলাটি পাশের ঘরের দরজার চাবিটা খুলে দিলে। খোলবার

সময় বাঁ হাতটা ব্যবহার করলে। এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, তবু এগুচি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল।

পাশের ঘরটায় কম কম আলো, মহিলাটি দরজাটা ভেজিয়ে টেবিলের ওপর চাবিটা রাখল।

"এই চাবি। ঘুম যদি না আসে, বালিশের পাশে ঘুমের ওষুধ আছে।"

"শোবার আগে আমার একটু সুরা পানের অভ্যাস আছে।"

"না আমরা কোনো সুরাজাতীয় পানীয় রাখি না।"

"ঘুমের জন্যেও পেতে পারি না?"

"না।"

"মেয়েটি পাশের ঘরে ঘুমচ্ছে।"

"ও!" এগুচি একটু আশ্চর্য হল। কে জানে মেয়েটি কখন থেকে ও ঘরে ঘুমচ্ছে। অবশ্য মেয়েটি যে পাশের ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় অপেক্ষা করে, এ কথা এগুচি তার এক বন্ধু, যে এখানে মাঝে মাঝে আসে তার কাছে শুনেছে। তবু আজ পরিস্থিতির মুখোমুখি এসে অবিশ্বাস্য মনে হতে লাগল।

"শুভরাত্রি।" মহিলাটি চলে গেল।

বৃদ্ধ এগুচি পাশের ঘরটির দিকে তাকাল, সিডার কাঠের দরজা। সাধারণ দরজা। এই ঘরখানাকে পার্টিশান করেই বোধ করি তৈরি করা হয়েছে পাশের ঘরখানা, প্রসুপ্ত রূপসীদের জন্য।

পাশের ঘরে যাবার আগে এগুচি বসে রইল। সমুদ্র তরঙ্গের শব্দ শোনা যায়, বাড়িখানা সমুদ্রের একেবারে ধারেই। আসন্ন শীতের ক্ষুরধার বাতাস। আসতে দেরি হয়েছিল বলে এগুচির এ বাড়িটার আশপাশটা দেখা হয়ে ওঠে নি। ছোট বাড়িটার

তুলনায় এর বাগানটা একটু বড়ই। বাগানে ছিল পাইনগাছ। খোঁচা খোঁচা কাঁটাগুলো আকাশের দিকে উঁচিয়ে রয়েছে।

চাবিটা হাতে করেই এগুচি একটা সিগারেট ধরাল। প্রথমটা দু এক টান খেয়েই সে ফেলে দিলে। পরেরটা খেলে শেষ অবধি। মনে একটা শূন্যতার বোঝা। শোবার আগে একটু হুইস্কি খাবার অভ্যাস তার। ঘুমও ভালো হয় না। দুঃস্বপ্ন দেখে।

কোনো এক কবিতায় ছিল জলে ডোবা মৃতদেহের কথা। ঘুম পাড়ান মেয়েটির কথা মনে হতেই এগুচির মনে হল, কে জানে হয়ত মেয়েটাকে দেখলে সেই কথাই মনে হবে। কি ভাবে যে ঘুম পাড়ান হয়েছে তা সে জানে না, তবে স্বাভাবিক ঘুম এ নয়। কে জানে ঘুমের ওষুধের অপব্যবহারে হয়ত মেয়েটার চোখের কোলে কালি। কিংবা হয়ত চেহারাটা ফুলো ফুলো।

সাতষট্টি বছর বয়সে এগুচি বহু মেয়ের সঙ্গে অনেক কুৎসিত রাতও কাটিয়েছে। সেইগুলোই ভোলা শক্ত। চেহারার জন্য কুৎসিৎ নয়, কুৎসিত সেই মেয়েগুলোর জীবনের ট্র্যাজেডি। আজ কি সে আর একটি যোগ করতে উদ্যত সেই কুশ্রীতার অঙ্কে? একটি ঘুমন্ত তরুণীব পাশে এক বৃদ্ধ শুয়ে রাত কাটালে; তরুণীটি জানতেও পারবে না; এর চেয়ে কুৎসিত আর কি হতে পারে?

যাদের বিশ্বাস করা যায়— ওই মহিলাটি বলছিল না? যে লোকটি এগুচিকে এ জায়গাটার কথা বলেছিল, সে ছিল অতিবৃদ্ধ। জায়গাটা ওই রকম মহাস্থবিরদের জন্য বলেই বোধহয় মহিলাটি কোনো প্রশ্ন করেনি। তাই বুঝি বলেছিল যাদের বিশ্বাস করা যায়। এগুচিকে বোধহয় এখনো অতটা বিশ্বাস করা যায় না। তবু বার্ধক্যের গ্লানি যেন তাকে চেপে ধরলে। তবে বৃদ্ধদের উপর আরোপিত নিষেধ

বিধি লঙ্ঘন করবার অসঙ্গত ইচ্ছা তার নেই।

পর্দাটা গোলাপী ভেলভেটের। অল্প আলোয় রংটা যেন আরো গাঢ় দেখায়। রংটা যেন এ আলোতে তরল হয়ে উঠেছে। চার দেয়ালে পর্দা। দরজাটা বন্ধ করে, সে মেয়েটির দিকে তাকালে।

না। মেয়েটি সত্যিই ঘুমচ্ছে। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস থেকেই তা বোঝা যায়। মেয়েটা এতটা সুন্দর, সে আশা করেনি। শুধু সুন্দরী নয়, তরুণী। বয়স খুবই অল্প। তার দিকেই মুখ ফেরানো। শরীরটা দেখা যাচ্ছে না। তবু কুড়ি পার হয়নি বোঝা যায়। এগুচির বুকে যেন অন্য কারুর হৃৎপিণ্ড ঘা মেরে চলেছে।

লেপের কিনারায় ডান হাতের কব্জিটা। আঙুলগুলো যেন নরম নরম আলোতে কুঁদে তৈরি করা বলে মনে হয়। গোলাপী আলোয় আঙুলের মাথাগুলি যেন কুঁড়ির মতন দেখাচ্ছে।

"তুমি কি জেগে উঠবে?" মনে মনে প্রশ্ন করে কুঁড়ির মতো আঙুলগুলিতে সে হাত রাখল মেয়েটি যে চোখ খুলবে না ও জানত। কে এই মেয়েটি? চোখের পাতাগুলো ঝাঁপালো ঝাঁপালো। মুখে কোনো প্রসাধনের ছাপ নেই। নিজে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সে সব কিছু লক্ষ্য করছিল। আলোটা উপর থেকে এসে পড়ছে। কিন্তু এ আলোটা নেভাবার উপায় নেই।

ইতস্তত বোধ করে সে লেপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। তার উপস্থিতিতেও যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। গভীর নিদ্রায় মগ্ন। স্বাভাবিক ঘুম হলে তরুণী মেয়েটির কোনো না কোনো রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা যেত অবশ্যই। কিন্তু এ স্বাভাবিক ঘুম নয়। এই ভেবেই আরো তার ছুঁতেও ইতস্তত বোধ হতে লাগল। হাঁটুটা একটু সামনে এগোন। সমস্ত ভঙ্গিটাই কেমন নগ্ন; অসহায়

রকমের নগ্ন। মেয়েটি খুব লম্বা নয়।

যে আঙুলগুলি নিয়ে এগুচি নাড়াচাড়া করছিল। সেগুলিও যেন গভীর ঘুমে অচেতন। বালিশটা একটু টেনে নিতেই আঙুলগুলো অসহায় ভাবে ঝরে গেল।

একটি জীবন্ত খেলনা যেন। কিংবা বলা যায়, একটি জীবন্ত মানুষ দিয়ে যেন একটি খেলনা তৈরি করা হয়েছে তার জন্য। কিন্তু খেলনা কেন? ও নিয়েই জীবন। যাকে ছুঁলে পাওয়া যাবে জীবনের স্পর্শ।

মেয়েটির কানের দিকে হঠাৎ এগুচির চোখ পড়ল। কানের পাটা-গুলিতে লাল রক্তের আভা, যেমনটি আঙুলগুলিতে। মেয়েটির চুল লম্বা, চুল সরিয়ে এগুচি মেয়েটির কানের দিকে তাকাল। ঘরে রাখা বাক্সটার দিকে হঠাৎ এগুচির নজর পড়ল। বাক্সর উপর তার নিজের জামা কাপড়গুলো। কিন্তু মেয়েটির? মেয়েটি যে কিছু না পরে এ ঘরে এসেছিল, এ কথা ভেবে এগুচি যেন চমকে উঠল।

দুধে বাচ্ছাদের গায়ে যেমন গন্ধ থাকে, মেয়েটির গায়ে যেন তেমনি গন্ধ। অসম্ভব। মেয়েটির নিশ্চয় বাচ্ছা হয় নি। তা হলে ওর স্তন অন্যরকম দেখাত। এগুচি লেপটা সরিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করল। না; এ কোনো গর্ভিনী মেয়ের স্তন নয়। সে ভালো করে হাত দিয়ে দেখল।

এগুচি পালিয়ে যেতে চাইল যেন। কিন্তু আর ফেরার পথ নেই।

"ওঠ ওঠ", এগুচি মেয়েটিকে নাড়া দিল।

মেয়েটি যে ঘুমিয়ে রয়েছে, কোনো সাড়া দিতেও পারবে না। এই-টাই এগুচিকে ব্যথিত করে তুলল। অথচ তার বৃদ্ধ বন্ধু কিগা,

যে তাকে এখানের পরিচয় দিয়েছে, সে এই নগ্ন, ঘুমন্ত মেয়েদের সঙ্গে রাত কাটানোটাকে একটা এ্যাডভেঞ্চার বলে মনে করেছে। এমনি ঘুমন্ত মেয়ের পাশে জেগে থেকেই কিগার নিজেকে জীবন্ত মনে হয়েছে।

এগুচির মনে হল, তার আগে হয়ত আর কোনো কোনো বৃদ্ধ, ঘুমে অচৈতন্য এই মেয়েটির পাশে শুয়ে রাত কাটিয়ে গেছে। কোনো বৃদ্ধ হয়ত মেয়েটির শরীরের প্রতি অংশকে চুম্বন কি আলিঙ্গন করেছে। আবার কেউ হয়ত কান্নায় ভেঙে পড়েছে। মেয়েটা কিছুই জানতে পারে নি।

ঠিক এই সময় মেয়েটি যেন একটু নড়ল। পাশ ফিরে এগুচির দিকে ফিরে শুলো। এগুচি একটু সরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, যদি সে চোখ খোলে।

সমুদ্রের তরঙ্গের শব্দ হঠাৎ যেন বেশী তীব্র হয়ে উঠল। যেন আরো কাছে। মেয়েটির নিশ্বাসের শব্দটাও যেন আরো বেশী মনে হতে লাগল। শরীর খারাপ হল না তো? এগুচি ভাবল। আর দুধের গন্ধটা?

এগুচির নাতি আছে। তাদের গায়ে দুধে গন্ধ। তার তিন মেয়ে। সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেপুলেও হয়েছে সবার। যখন এই মেয়েরা ছোট ছিল, সে তাদের যখন আদর করেছে, তাদের গায়ে দুধে গন্ধ ছিল। এগুচি পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করলে।

বালিশের পাশে যে ঘুমের বড়ি আছে, খেয়ে নিলে হয়। মেয়েটিকে যে ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে। এ দুটো বড়ি নিশ্চয় তার চেয়ে অনেক কমজোর। একটায় বোধ হয় খুব কম ঘুম হবে দুটোতে রাতটা বোধ হয় কেটে যাবে।

দুধের গন্ধে এগুচির আর একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। দুধের গন্ধে একবার একটি গাইসা মেয়ে তার জামাটা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। জামায় "দুধের গন্ধ কেন ?" এগুচির একটি বাচ্চা আছে শুনে গাইসা মেয়েটি তার জামাটা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল, "লজ্জা করে না, একটা দুধের বাচ্চাকে কোল থেকে নামিয়েই এখানে আসতে ?" সেই থেকেই এগুচির সঙ্গে সেই গাইসা মেয়েটির সম্পর্কচ্যুতি ঘটেছিল।

বিয়ের আগে এগুচির এক প্রণয়িনী ছিল। একদিন মনে আছে তার স্তনে রক্ত দেখা গেল। অবশ্য তার কারণও এগুচি। ব্যাপারটা মেয়েটিও উত্তেজনায় টের পায় নি, এগুচিও জিভ দিয়ে চেটে রক্তের দাগটা মুছে নিয়েছিল।

হঠাৎ এই মেয়েটির কাছে শুয়ে কেন পুরানো স্মৃতিগুলো তার মনে আসছে ? এই ঠোঁট, পুরুষের এই দুটি ঠোঁটও যে কোনো জায়গা থেকে রক্ত বার করে আনতে পারে নারীদেহের। অবশ্য এগুলো বাড়াবাড়িই হয়ে গিয়েছিল। তবু এ কথা ঠিক নারী পুরুষকে দেয় শক্তি। সাতষট্টি বছর বয়সে পৌঁছেও এগুচির এ কথা মনে হল।

আরো মনে পড়ে যায়।

"ঘুমিয়ে পড়ার আগে, যারা আমায় চুমু খেলে আমার ভালোই লাগবে, তাদের কথা ভাবি। কিন্তু তাদের এক আঙুলে গোণা যায়।" এক বিরাট ব্যবসায়ীর স্ত্রী একথা এগুচিকে বলেছিল। মাঝবয়সী মহিলাটি বুদ্ধিমতী। ওর সঙ্গে ওয়ালজ নাচতে নাচতে ভদ্রমহিলা একথা বলেছিলেন। কে জানে এই স্বীকারোক্তির মানে কি এই ছিল যে এগুচির চুম্বনে ভদ্রমহিলার বীতরাগ

নেই।

মহিলাটির গলাটা কেমন শুকনো শুকনো ছিল না কি? এগুচি কোনো কথার উত্তর দেয় নি। কিন্তু কথাটা ভোলেও নি। কে জানে, ভদ্রমহিলা তাকে একটু খেলাবার জন্যেই কথাগুলো বলেছিলেন কি না। ভদ্রমহিলা মারা গেছেন। কিন্তু কথাগুলো?

ঘুম না এলে এগুচির এই ভদ্রমহিলার কথায় ওইরকম শুনতে চেষ্টা করেছে। তবে শুধু চুম্বনটুকুই নয়। তার জীবনের প্রেমের ঘটনাগুলোরই আনুপূর্বিক রোমন্থন করেছে সে।

এগুচি হঠাৎ স্মৃতি রোমন্থন থেকে জেগে উঠে পাশের মেয়েটির স্তনে হাত দিয়ে দেখতে চাইল। তার স্তনটা ভিজে কি না। গড়নটি চমৎকার গোল। আচ্ছা সব প্রাণীদের মধ্যে কেবল মানুষের মধ্যেই দেখা যায় নারীজাতির স্তনের এই অসামান্য সৌন্দর্য। কেন?

ঠোঁটের সম্পর্কেও এ কথা বলাযায়। শোবার আগে যখন মেয়েরা লিপস্টিপ, গালের রং, সব ক্রিম দিয়ে ঘষে তুলে ফেলে, সেই দৃশ্যের কথা এগুচির মনে পড়ল।

স্তনের বোঁটা কালো হলে এগুচির ভালো লাগে না। এ মেয়েটির বোঁটা কেমন যেন গোলাপী রঙের। এগুচির ইচ্ছা হচ্ছিল, ওই স্তনের উপর চুম্বন এঁকে দিতে। শুধু চুম্বন কেন। এই মেয়েটির ঘুম কিছুতেই যখন ভাঙবে না, তখন আরো বহুদূর পর্যন্ত যাওয়া যায়। কিন্তু মেয়েটিকে ঘুমন্তই এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে এগুচির আর কিছু করার ইচ্ছা চলে গেল।

"এবার ঘুমালে হয়", এগুচি লক্ষ্য করলে যে সে নিজেই বিড়বিড় করে কথা বলছে। "চিরকালের মতো।"

মেয়েটির কনুইটা বাঁকানো ছিল বলে এগুচির জায়গা কম হচ্ছিল শুতে। কনুইটা সোজা করে দিতে গিয়ে সে মেয়েটির নাড়ীতে হাত দিয়ে দেখল, গতি স্বাভাবিক। নিশ্বাসের গতিও সহজ, স্বাভাবিক। সমুদ্রের দিক থেকে যে শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, তার ছন্দের সঙ্গে এই মেয়েটির শ্বাস ও নাড়ীর ছন্দের যেন মিল আছে।

যে মেয়েটির স্তনে রক্তের দাগ ছিল, সেই মেয়েটির সঙ্গে সে কিয়োতো গিয়েছিল। কিয়োতো থেকে মেয়েটিকে তার এক আত্মীয় জোর করে টোকিওতে পাঠিয়ে দেয়। অল্প দিনের মধ্যেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়।

বেশ কিছুদিন বাদে মেয়েটির সঙ্গে আবার এগুচির দেখা হয়। তখন সে জিজ্ঞাসা করেছিল মেয়েটি সুখী কি না।

"হ্যাঁ, আমি সুখী।"

"ছেলে না মেয়ে?"

"মেয়ে।"

এগুচি বাচ্চাটার দিকে তাকাল। কার মতো ওই শিশুর মুখ? এগুচির সঙ্গে কি ওই শিশুর কোনো মিল আছে? কিয়োতোর কাছাকাছি এক ঝর্ণার ধারায় একদিন এগুচি আর সেই মেয়েটি নগ্ন হয়ে স্নান করেছিল। আজ আবার বিশেষ করে সেই সব কথা যেন মনে পড়ছে এই রাতে। ঘুমন্ত মেয়েটির যৌবনই বুঝি এগুচির মনে সেই সব স্মৃতি টেনে আনছে।

এগুচির ঘুম আসছিল না। পাশে ঘুমন্ত মেয়েটিকে নগ্ন দেখতেও তার ইচ্ছা করছিল না। বালিশের কাছে রাখা প্যাকেটটি সে খুলল। ঘুমের ওষুধ। তবু এগুচি ইতস্তত করতে লাগল। বেশ

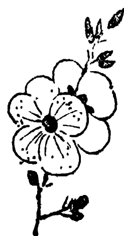
খানিকটা জল দিয়ে সে একটা পিল খেয়ে ফেললে। সে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু স্বপ্নে দেখলে, যে তার এক মেয়ের যেন বিকলাঙ্গ একটি সন্তান হয়েছে। শিশুটিকে ওর মার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেল। ভয়ে এগুচির ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের ওষুধের ভিতর নিশ্চয় বিকলাঙ্গতার উপকরণ ছিল না। গোপনে নিষিদ্ধ আনন্দ পাবার আশায় এসেছে বলেই কি সে এই দুঃস্বপ্ন দেখল? তার সব মেয়েদেরই স্বাভাবিক শিশু জন্মেছে।

ভালো করে ঘুমবার জন্য এগুচি অন্য পিলটা খেয়ে ফেললে। মেয়েটি এখন তার দিকে পিছন করে শুয়ে আছে। "এদিকে তাকাও" সে বললে।

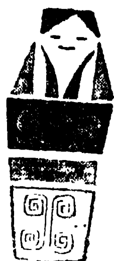
বলবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি যেন তার কথায় সাড়া দিয়েই পাশ ফিরে শুলো।

"তুমিও কি দুঃস্বপ্ন দেখছ?" সে জিজ্ঞাসা করল।

এগুচি তখনি ঘুমিয়ে পড়ল।



২



এগুচি ভাবেনি যে আবার কখনো সে প্রসুপ্ত রূপসীদের ঘরে আর কখনো যাবে। এই রকমই তার মনে হয়েছিল যখন পরদিন সকালে সে চলে এলো।

দিন পনেরো পরে টেলিফোন এলো। আর একবার সে যেতে চায় না কি? সেই মহিলাটির গলা। যেন সেই নিষিদ্ধ পুরীর ফিসফিস কথা।

"আন্দাজ ক'টা হবে আসতে?"

"ন'টার কাছাকাছি।"

"মেয়েটি এখানে নেই। থাকলেও এত তাড়াতাড়ি তো ঘুমিয়ে পড়বে না।"

এগুচি যেন চমকে উঠল। কোনো উত্তর দিলে না।

"এগারোটা নাগাদ আপনার জন্য অপেক্ষা করব।"

মহিলাটির কথা আস্তে। কিন্তু এগুচির হৃৎপিণ্ড ঘোড়ার মতো দৌড়তে শুরু করেছে।

"তা হলে এগারোটা নাগাদ," উত্তর দিল এগুচি শুকনো গলায়।

ঘুমবার আগে একবার মেয়েটিকে দেখতে পারলেই তো ভালো হত। কিন্তু কথাটা বলতে গিয়ে যেন তার গলায় আটকে গেল। কিন্তু তা হয়ত ওই বাড়ির গোপন নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ হয়ে যেত। নিয়মগুলো অদ্ভুত বলেই তার এত কড়াকড়ি। বৃদ্ধদের বিষণ্ণ অনুরোধ মানবার জায়গা ওটা নয়।

যখন এগুচিকে বলা হল যে ন'টা হলে বড্ড আগে হয়ে যায়, মেয়েটা তখনও ঘুমবে না। এগারোটা নাগাদ ঘুম পাড়িয়ে ওকে তৈরি রাখবে, তখনই ও বুঝল যে মেয়েটিকে জাগানো যাবে না।

পনেরো দিনের মধ্যে আবার ওখানে যাওয়াটা কি বেশী তাড়াতাড়ি হল, নাকি বেশী দেরী করে? সে অবশ্য যাবার ইচ্ছাটাকেও চাপবার কোনো চেষ্টাই করে নি। বার্ধক্যের এ রকম কুশ্রীতার মধ্যে আবার গা ভাসানোর ইচ্ছাও তার ছিল না। একটা অপরাধবোধও তার মনের মধ্যে ছিল। আবার সেই সঙ্গে তার এও মনে হয়েছে, যে তার সাতষট্টি বছরের জীবনে এত পরিচ্ছন্ন রাতও সে আর কাটায় নি। সকালে উঠেও সেদিন ঠিক এই কথাই তার মনে হয়েছিল। ঘুমের ওষুধটা কাজ করেছিল। আটটা নাগাদ তার ঘুম ভেঙে ছিল। ঠিক যেন নিষ্পাপ শিশুর জাগা।

মেয়েটির মুখটা ছিল তার দিকে ফেরানো। লম্বা চুলগুলো বালিশে ছড়ানো ছিল। মেয়েটিকে দেখেও তার পবিত্রতা সম্পর্কে তার

কোনো সন্দেহ ছিলনা। রাতেরসবকিছু ভুলে সেই মেয়েটির প্রতি একটা গভীর স্নেহ এগুচি অনুভব করতে শুরু করল। শিশুর যেমন মায়ের স্তনের প্রতি মমতা থাকে, মেয়েটির উন্মুক্ত স্তনগুলির প্রতিও যেন সে অনুরূপ মমতা বোধ করতে লাগল।

পাশের ঘরের দরজাটা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

"উঠেছেন নাকি ?" বাড়ির মহিলাটির গলা শোনা গেল। "প্রাত-রাশ এনেছি।"

"এই যে।" এগুচি তাড়াতাড়ি জবাব দিল। ঝিলমিলির ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছিল।

"নিয়ে যাব ?"

"হ্যাঁ।"

এগুচি একবার মেয়েটির চুলে হাত দিয়ে উঠে পড়ল। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল মেয়েটি উঠে পড়বার আগে, ওই মহিলা খদ্দেরকে বিদায় করতে চায়। কে জানে মেয়েটি কতক্ষণ ঘুমবে ? কিন্তু এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা উচিত হবে না।

"মেয়েটি সুন্দর।" সে বললে।

"হ্যাঁ। আশা করি আপনার সুখস্বপ্নেই রাত কেটেছে।"

"হ্যাঁ তাই বলা যায়।"

"ঝড় থেমে গেছে।" মহিলাটি প্রসঙ্গটা বদলাতে চাইল।

এই দ্বিতীয়বার আসার সময়ে এগুচির আর সেই প্রথমবারের কৌতূহলটা ছিল না। ন'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষার ফলে কেমন যেন একটা আচ্ছন্নতা সে বোধ করছিল।

সেই এক মহিলা দরজা খুলল। চাও ঠিক সেইরকমই ভালো। কিন্তু গতবারের তুলনায় এগুচি যেন একটু বেশী নার্ভাস। কিন্তু

তা হলেও সে অভিজ্ঞ পুরানো খদ্দেরের মতো ব্যবহারটা বজায় রাখতে পারল।

"আসার সময় বাগানটা ভালো করে দেখা হয় নি," এগুচি কথাটা শুরু করার চেষ্টা করলে।

"ঠাণ্ডাটা খুব পড়েছে। আমি তাই ডবল সাইজের ইলেকট্রিক কম্বল দিয়ে দিয়েছি। ওর দুটো সুইচ আছে। ইচ্ছামতো গরম ঠাণ্ডা করে নিতে পারবেন।"

"আমি কখনো ইলেকট্রিক কম্বলের নিচে শুই নি।"

"ইচ্ছা হলে আপনার দিকটা বন্ধ করে শুতে পারেন। কিন্তু মেয়েটির দিকটা চালিয়ে রাখবেন।"

এগুচি বুঝতে পারলে যে এর কারণ মেয়েটি নগ্ন।

"বাঃ এ তো মন্দ নয়; একই কম্বলে দু'জনে ইচ্ছামতো বেশী কম করতে পারে।"

"হ্যাঁ, আমেরিকান জিনিস। কিন্তু মনে থাকে যেন, মেয়েটার দিকটা বন্ধ করবেন না। বুঝতেই তো পারছেন, যত ঠাণ্ডাই লাগুক সে বেচারীর ঘুম ভাঙবে না।

এগুচি উত্তর দিল না।

"এ মেয়েটি আগেরটির চেয়ে অভিজ্ঞ।"

"তার মানে?"

"এ খুবই সুন্দরী। কিন্তু কিছু অন্যায় যেন না হয়।"

"এ কি সেই মেয়েটি নয়?"

"না। প্রত্যেকবার এক একটি নতুন মেয়েই ভালো নয় কি?"

"আমার অভ্যাসটা সে রকম নয়।"

কথাটা শুনে মহিলাটির ঠোঁটের কোণে যেন একটা চাপা হাসির

ঝিলিক খেলে গেল। "আমার অতিথিরা সকলেই ভদ্র, বিশ্বাস-যোগ্য।" মহিলাটি তার দিকে না তাকিয়েই কথাগুলি বলছিল। কথার বিদ্রূপটুকু এগুচির গায়ে বিঁধল। কিন্তু কি উত্তর দেওয়া যায়, তা সে ঠিক করে উঠতে পারলে না। বেশ বোঝা যায় বহু-কালের পোড়খাওয়া আড়কাঠি।

"আপনি ভাবছিলেন, আজ একজন, কাল একজন মেয়ের কথা, কিন্তু আগের বা এবারে যে মেয়েটির সঙ্গে আপনি রাত কাটিয়ে-ছেন, তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারছে না কি হয়েছিল রাতে।"

"কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক ?"

"তার মানে ?"

কোনো বৃদ্ধ যে মেয়েটির অজ্ঞাতে তার সাহচর্য ভোগ করলে, তাতে মানবিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হল, এটা সে কি করে বোঝাবে। আর তাই যদি হয়, তা হলে সেই বা এসেছে কেন ?

"আর অন্য মেয়ে হলেই বা ক্ষতি কি ?" মহিলাটি হেসে উঠল। যদি সে মেয়েটিকে এত ভালো লেগে থাকে, তা হলে এর পরের বার বরং তাকে আনিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু তখন আবার মনে হবে, যে এবারের মেয়েটি ভালো ছিল।"

"আচ্ছা, অভিজ্ঞ মানে ? যখন ঘুমিয়েই রয়েছে।"

"হ্যাঁ।" মহিলাটি উঠে দাঁড়াল। দরজাটি খুলে পাশের ঘরে গেল, ভিতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে, চাবিটা এগুচিকে দিয়ে বললে, "আপনার সুনিদ্রা হোক।"

কাপে গরম জল ঢেলে এগুচি ধীরে সুস্থে আর এক কাপ চা খেল। ধীরে সুস্থেই তার খাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তার হাত কাঁপছিল। কাঁপাটা বয়সের জন্য নয়। বিশ্বাসযোগ্য লোক ? যে সব বিশ্বাস-

যোগ্য বৃদ্ধ এখানে আসে যায়, তাদের পক্ষ থেকে যদি সে নিয়ম ভঙ্গ করে তাদের এই অপমানের হাত থেকে বাঁচায়? আর মেয়েটির দিক থেকে সেটাই কি বেশী মানবিক হত না? সে জানে না, মেয়েটাকে কতটা ওষুধ দেওয়া হয়েছে। তবু কি তাকে জোর করে তোলা যায় না? সে এইসব ভাবতে লাগল। কিন্তু তার মন যেন ভালো করে সাড়া দিতে চাইল না।

বার্ধক্যের যে নিদারুণ অক্ষমতায় এখানকার খদ্দেররা পীড়িত, এগুচিও অচিরেই তার প্রভাবে পড়বে। যৌনতার যে বিশাল পরিবেশ, এই সাতষট্টি বছর ধরে এগুচির তার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় আছে। বৃদ্ধদের জায়গায় তরুণরা প্রতিনিয়ত আসছে। যে দিনগুলো চলে গেছে তার জন্য বৃদ্ধদের ব্যথা। যে মেয়েরা ওঠে না, তারা এই সব বৃদ্ধদের সময়হীন স্বাধীনতা। স্তব্ধতার মধ্যে তারা এই বৃদ্ধদের সঙ্গে যেন তাদের নীরব কথার অংশীদার।

সে পাশের ঘরের দরজাটা খুলে দিল। যেন একটু উষ্ণ গন্ধ। মেয়েটির দুটি হাতই লেপের উপর। নখগুলো গোলাপী। ঠোঁটে গভীর লাল লিপস্টিক।

"অভিজ্ঞ?" কম্বলের গরমে ওর মুখটি লাল, চোখের পাতা, গাল দুটি বেশ ভরাট। ধপধপে গলাটিতে পর্দার রংয়ের আভা। একটা নরম গন্ধে যেন ঘরটা আচ্ছন্ন। সে কাপড় চোপড় ছাড়ল।

এক এক জন এমন মেয়ে থাকে, তারা যে কোনো বয়সের লোককে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করে। এক অসামান্য দৈহিক আকর্ষণ। এগুচি চোখ বুজে ভাবছিল। মহিলাটি খুব অন্যায় বলে নি। আগের মেয়েটির চেয়ে এ ভালো। সারা পরিবেশে কেমন একটা সুগন্ধ। সুগন্ধী সম্পর্কে এগুচির বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। সে ভাবছিল গন্ধটা

হয়ত মেয়েটির নিজস্বই। মেয়েটার হাতটাও যেন কেমন আলিঙ্গনের ছলে তার দিকেই বাড়ান।

"জেগে আছ?" মেয়েটির চিবুকে নাড়া দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল। আবার আর একটু জোর করেই নাড়া দিল। মেয়েটি ওপাশ ফিরে শুল। সত্যি বেচারী গভীর ঘুমে অচেতন।

আগের মেয়েটি যে আজকে নেই, এই কথা শুনে সে এখানের গৃহকর্ত্রীর কাছে আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু এ কথা ঠিক, রোজ রোজ ঘুমের ওষুধে মেয়েগুলির শরীর খারাপ হতে পারে। এখানে কি মাত্র একজনেরই বন্দোবস্ত আছে? তাই যদি হয় তা হলে তো খুব বেশী সংখ্যক মেয়ের প্রয়োজন হবার কথা নয়।

মেয়েটির চিবুকে হাত দিতে গিয়ে এগুচি দেখতে পেল, তার হাতে লিপস্টিকের রং লেগে গেছে। এটা মুছে ফেলা দরকার। কিন্তু কোথায় মুছবে? বালিশে মোছা যেতে পারে। তা হলে মনে হবে মেয়েটাই বুঝি লাগিয়েছে। কিন্তু হাতটা একটু ভিজিয়ে না নিলে তো মোছা যাবে না। কিন্তু নিজের মুখে আঙুলটা পুরে আঙুলটা ভিজিয়ে নেবার কথা মনে করতে তার যেন কেমন ঘেন্না ঘেন্না করতে লাগল। সে তখন আঙুলটা মেয়েটির কপালের চুলে ঘষতে লাগল। আঙুলগুলো চুলে ঘষা খেয়ে ছোট ছোট বিদ্যুৎ তরঙ্গ তার আঙুলে বয়ে যেতে লাগল।

"অগাধে ঘুমচ্ছে।" সে মনে মনে ভাবল। বালিশে মুখটা গুঁজে আবার পাশ ফিরল। ভঙ্গিটা দেখে মনে হয় যেন কষ্ট হচ্ছে। কাঁধের দিকটা যেন একটু কেঁপে কেঁপে উঠল। কিন্তু তা কয়েকবার মাত্র তারপরই আবার শান্ত হয়ে গেল। এই সময়ে মেয়েটির দেহের অন্য দিকেও তার নজর। না মেয়েটির কুমারীত্ব অটুট।

থেকে থেকে তার মনে যে সব চিন্তা আসছিল, এখন সে চোখ বন্ধ করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। কোনো তরুণের পক্ষে যা সহজ হত না, তা তার বয়সের জন্য অনেক সহজ হল। সে আবার চোখ খুলল। মেয়েটি এখন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। কুমারী বেশ্যা। তা ছাড়া আর কি ?

এগুচির মনে হতে লাগল, এখানে যে সব বৃদ্ধরা আসে এদের আনন্দেও গভীর বিষণ্ণতা। সে বিষণ্ণতা কত গভীর, তা সাক্ষাৎ-ভাবে অনুধাবন করা দুরূহ। আর এই মেয়েটির কৌমার্য এ ও কি তারই অবদান নয় ? যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এই মেয়েটির কৌমার্যের সম্মানটুকু ওই বৃদ্ধদের অপমানেই পাওয়া।

মেয়েটির হাতটা বোধ হয় ভেরে গিয়েছিল। হাতটা সে অন্যভাবে রাখল। সেই সময় হাতটি এগুচির হাতে ঠেকল। এগুচি তার নিজের হাতে হাতখানি ধরল। আঙুলগুলো ঠাণ্ডা। সেগুলো ও নিজের হাতে জোর করে চেপে ধরলে। একেবারে শিথিল। কোনো জোর নেই হাতে। হাত ছেড়ে গলার পিছন থেকে শির-দাঁড়ার উপর দিয়ে হাত বোলাতে বোলাতে এগুচির হাতখানা মেয়েটির পা পর্যন্ত নেমে গেল।

এখানে যে সব বৃদ্ধরা আসে যায়, তারা এ মেয়েদের সম্পর্কে কিছুই জানে না। এমনকি কি পোষাক তারা পরে এসেছিল তা পর্যন্ত জানবার উপায় নেই।

যথারীতি বালিশের পাশে দুটি ঘুমের বড়ি মুড়ে রাখা ছিল। কিন্তু আজ সে ভাবল এখনি বড়ি না খেয়ে আরো কিছুক্ষণ সে মেয়ে-টিকে লক্ষ্য করবে। মেয়েটি শক্তিমতী। ঘুমের মধ্যেও তার নড়াচড়া দেখলেই বোঝা যায়। বিড়বিড় করে ঘুমের মধ্যেও মেয়েটি যেন

কথা বলছিল। “ও কি করছ?” কথাটা যেন এগুচির কানে বাজল।

“আমি তো কিছুই করছি না। তুমি কি জেগে আছ?” মেয়েটি ঘুমন্তই কথা বলছে। তাকে একটুও জাগান অসম্ভব।

“না, চলে যাচ্ছে কেন?”

না মেয়েটি কোনো স্বপ্ন দেখেই কথা বলছে। এগুচি তার হাতটা ধরলে, যেন তাকে স্বপ্নের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যই। মেয়েটির স্বপ্নেও কেমন বিষণ্ণতা। এগুচি ওকে জড়িয়ে ধরলে। এগুচির বুকের চাপে ওর স্তনদুটি একেবারে চেপ্টা হয়ে গেল। মেয়েটিও যেন তাকে জোরে জড়িয়ে ধরেছে। তবে কি স্বপ্নের মধ্যে এগুচিকেই তার মা ভেবে সে জড়িয়ে ধরছে? কিংবা এমনও হতে পারে যে এই সব বৃদ্ধদের বেশীদূর এগিয়ে আসাটা বন্ধ করার জন্য এই মেয়েটি গভীর ঘুমেও কথা বলার অভ্যাস করেছে। তাই কি এ বাড়ির গৃহকর্ত্রী মহিলা, একে বলেছিল অভিজ্ঞ? মেয়েটির গন্ধ এগুচিকে বহু ফুলের কথা মনে করিয়ে দিলে। প্রাচীন লেখক ইচিকাওয়ার বাড়ি কিয়োতোয়। সেখানের ক্যামেলিয়া আর নারার রডোডেনড্রন।

ফুলের কথা মনে পড়তেই তার নিজের বিবাহিতা মেয়ে তিনটির কথা মনে পড়ে গেল। এই সব ফুল দেখতে সে গিয়েছিল ওদের সঙ্গেই। একবার তিনজনই সঙ্গে ছিল, আর একবার ছিল, ওদের মধ্যে একজন। এখন তারা বিবাহিতা। বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গিয়েছে। ওদেরও বোধহয় আর ভালো করে মনে নেই। এগুচির কিন্তু মনে আছে। স্ত্রীকেও সে এইসব কথা অনেকবার বলেছে। তার স্ত্রী কিন্তু মেয়েদের কাছ থেকে দূরে চলে যায় নি, ওদের বিয়ে হবার

পরেও যেমন এগুচি গিয়েছে। তাই তাকে কবে তাদের সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গিয়ে, কি ফুল দেখেছে, তা মনে করতে হয় না।

বড় দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর, ছোটটিকে কাছাকাছি মনে হয়েছে। আজকের এই মেয়েটিকে যেন তাদেরই একজন বলে মনে হচ্ছে। সেবার ক্যামেলিয়া দেখার সময়, ছোট মেয়েটি তার সঙ্গে ছিল। ব্যাপারটা তার ছোট মেয়ের বিয়ের আগের। ছোট মেয়ের বিয়ের পরিস্থিতিটা খুব বেদনাদায়কই ছিল। দুটি তরুণ ছিল তার প্রেমাকাঙ্খী। তাদের প্রতিযোগীতার মধ্যে মেয়েটির কুমারীত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। সেই জন্যই বেরুতে হয়েছিল সেবার। বেচারীর মনটা একটু চাঙ্গা করতে।

ক্যামেলিয়া ফুলকে দুর্ভাগ্যের প্রতীক বলেই ধরা হয়। কারণ সাধারণ ক্যামেলিয়া যখন ঝরে, তখন ডাল থেকে সব ফুলগুলো একেবারে একসঙ্গেই ঝরে যায়। কিন্তু এখানের ডবল ক্যামেলিয়া গাছের অন্তত চারশো বছর বয়স। পাঁচরকম রংয়ের ফুল হয় এতে। আর প্রত্যেকটি ফুলের পাপড়ীগুলি পর্যন্ত ঝরার সময় একটি একটি করে ঝরে। তাই এখানের ক্যামেলিয়াকে পাপড়ী-ঝরা ক্যামেলিয়া বলে।

ওখানের মন্দিরের পুরোহিতের তরুণী স্ত্রী বলেছিল, "পাপড়ী ঝরে ঝরে গাছের তলার মাটিতে এত পুরু হয়ে যায় যে আমরা রোজ ঝুড়ি করে পাঁচ-ছ ঝুড়ি তুলে নিয়ে যাই।"

এগুচি তার মেয়েকে নিয়ে পশ্চিমের বারাণ্ডায় সন্ধ্যায় বসেছিল। গাছের পিছন দিয়ে সূর্য ডুবে গেল। তারা চেয়েছিল অস্তগামী সূর্যের দিকে। কিন্তু ফুল এত ঘন যে ফুলের ভাড়ে সূর্যের আলো

দেখা যাচ্ছিল না। সূর্য যেন ফুলের ভিতরেই ডুবে গেল। মনে হলো বুঝি ডুবন্ত সূর্য ক্যামেলিয়ার উপর ভেসে থেকে ডুবল। মন্দিরটা শহরের ঘিঞ্জি জায়গায়। ক্যামেলিয়া ছাড়া এই বাগানে আর কিছুই দেখার নেই।

"কত ফুল", এগুচি তার মেয়েকে বললে।

"সকালে উঠে অনেক সময় এত পাপড়ী ঝরে থাকে যে মাটি দেখা যায় না," পুরোহিতের স্ত্রী বললে।

এক গাছে পাঁচ রংয়ের ফুল? লাল আর সাদা তো রয়েইছে। এগুচি গুনে নিতে চাইছিল পাঁচ রংয়ের ফুল আছে কি না। চারশো বছরের গাছে এখনও এত ফুল ফোটে। বিকেলের রোদটুকু যেন গাছটা শুষে নিচ্ছে। তাই বুঝি ও গাছের এত অফুরন্ত প্রাণ।

এগুচির মেয়ে কিন্তু এই গাছে, কি ফুলে, এতটা বিমুগ্ধ হয় নি। তার দৃষ্টিতে যেন সেই গভীরতাটা ছিল। ফুলের চেয়ে, সে বুঝি নিজের দিকেই তাকাচ্ছিল বেশী করে। মেয়েদের মধ্যে এই মেয়েটি এগুচির সমধিক প্রিয়। তার প্রাণশক্তিও ছিল অফুরন্ত। সেই জন্য ছেলে-বন্ধুও তার ছিল বেশী, যারা ওকে ঘিরে রাখত। ওদের মধ্যে আবার দুজনকে ও বেশী পছন্দ করত। ওর মা তাদের ভালো করে জানত। ওর কুমারীত্বের অমর্যাদাও ঘটে এদেরই একজনের হাতে। প্রথম কয়েকদিনের মধ্যে ওর মেজাজের কেমন যেন একটা পরিবর্তন দেখা দিল। ওর মার সন্দেহ হল। কথায় কথায় ওর মা ব্যাপারটা তুললে। সহজ ভাবেই মেয়ে সব কথা স্বীকার করলে। ছেলেটা একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে কাজ করত। নিজস্ব একখানা ভাড়াকরা ঘরে সে থাকত। মেয়েটি ঘরে একদিন গিয়েছিল।

"ওকেই তো বিয়ে করবি?"

"কিছুতেই নয়।" ও উত্তর দিল। ওর মা উত্তর শুনে হতভম্ব। মার তাতে মনে হল, ছেলেটার পক্ষে হয়ত জবরদস্তি ছিল। এগুচির সঙ্গে ওর স্ত্রী কথা বললে। এগুচি অবশ্যই আঘাত পেল। কিন্তু তারচেয়ে বেশী আঘাত পেল যখন শুনল যে মেয়ে অন্য প্রেমিকটিকে বাকদান করে বসে আছে।

"এটা কি ঠিক হল?" এগুচির স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল।

"যাকে ও কথা দিল, তাকে সব কথা বলেছে কি?" এগুচির ধারাল গলায় জিজ্ঞাসা করল।

"জানি না। কথাটা শুনে আমারও খুব ভালো লাগে নি। জিজ্ঞাসা করব।

"দরকার নেই।"

"অনেকে ভাবে, না বলছি ভালো। অন্তত নিরাপদ তো বটেই। কিন্তু সবাই তো একরকম নয়। হয়ত না বললে সারা জীবন কষ্ট পাবে।"

ব্যাপারটা এগুচিরও খুব স্বাভাবিক মনে হয় হয় নি। একজনের সংস্পর্শে আসার পর, আর একজনকে বাকদান। এগুচি জানত ছেলে দু'জনই তার মেয়েকে খুব পছন্দ করে। তার ছোট মেয়ের মতো মেয়ের পক্ষে, প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় এটা করা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তবু সব বাপের যেমন মনে হয়, তারও তেমনি হল যে ব্যাপারটা ঘটতে না দেওয়ার মতো চরিত্রের দৃঢ়তা মেয়ের থাকা উচিত ছিল একটু ইতস্তত করে সে মেয়ের বিয়েতে মত দিলে। কিন্তু অন্য মেয়েদেব বিয়ের সময় যতটা খুশী হয়েছিল, যেন ততটা খুশী হতে পারল না। বিয়ের অল্প কিছুদিন আগে, ওকে নিয়ে ওরা কিয়োতোতে ক্যামেলিয়া ফুল ফোটা দেখতে এসেছিল। শুধু ফুলই

ছিল না। ফুলকে ঘিরে অজস্র মৌমাছির গুঞ্জন।

বিয়ের দুবছর পরে ওর একটি ছেলে হল। জামাই ছেলে বলতে অজ্ঞান। বিয়ের পর কোনো রবিবার কি ছুটির দিনে ওরা বেড়াতে এলে, মেয়ে হয়তো ওর মার সঙ্গে রান্নাঘরে কাজকর্ম করতে গেল; আর বাচ্ছাকে দেখাশোনা, খাওয়ানো সব করে জামাই। ব্যাপার-টার কোনো দাগও আছে বলে মনে হয় না। যদিও ওরা টোকিওতেই থাকে, কিন্তু আজকাল নিজের সংসার নিয়ে এত ব্যস্ত, যে মেয়ে আর যেন বাপের বাড়ি আসার সময়ই পায় না।

একদিন মেয়ে একা এসেছিল। এগুচি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছিস?"

"কেন? খুব ভালো," মেয়ে বললে। নিজেদের বিবাহিত জীবনের গল্প মেয়েরা বাপের কাছে কমই করে। তবু এগুচির ছোট মেয়ের স্বভাবটা ছিল যেরকম, তাতে তার বাপকেও আরো অনেক কিছু খোলাখুলি ভাবে বলার কথা। তবে ওর দিকে তাকিয়েই বাপ বুঝতে পারলে। যেন ফুলের মতো ও ফুটে উঠেছে। যদিও হয়তো মা হওয়ার ফলে ওর দেহে এ মঞ্জরন দেখা দিয়েছে, তবু তাই সবটা নয়। ভিতরে যে তার কোনো গ্লানি নেই, সেটাই তাকে এত সুন্দর করে তুলেছিল।

কেন এই ঘরে ঘুমন্ত মেয়েটির পাশে শুয়ে তার প্রস্ফুটিত ক্যামে-লিয়ার কথা মনে পড়ল? পাশের এই মেয়েটি কিংবা এগুচির ছোট মেয়ে কারুরই কি ছিল ক্যামেলিয়া ফুলের প্রস্ফুটনের গৌরব? তবু মেয়েটির দেহ থেকে জীবন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, আর বুঝি তাই তাকে ক্যামেলিয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

মেয়েটি দুটি হাত একসঙ্গে করে নিজের বুকের উপর রাখল। যেন

প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত ছুটি জোড় করা।
সমুদ্রের বুকে বর্ষণের শব্দ যেন। যেন দূরে কোনো গাড়ি চলার শব্দ এ নয়। এ শব্দ শীতের অন্তরের। একটা গাড়ি গেল দূরে।
সে নিজেও ঘুমিয়ে পড়ল।
মেয়েটির চাপা কান্নায় তার ঘুম ভেঙে গেল। তারপরই যা কান্না বলে মনে হচ্ছিল, তা হাসি হয়ে উঠল। বেশ বড় হাসির ধমক। ওর বুকে হাত রেখে সে ঠেলা দিল।
"তুমি কি স্বপ্ন দেখছ?"
হাসির পর আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। এগুচির চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল। সে ঘড়িটা চোখের কাছে তুলে দেখলে। সাড়ে তিনটে।
সকালে সেই মহিলাটিই তাকে জাগাল।
"ঘুম ভেঙেছে আপনার?"
কিছু উত্তর না দিতে আবার সেই প্রশ্ন। "উঠেছেন না কি?"
"স্যার শুনছেন?" এবার যেন অপেক্ষাকৃত ব্যস্ত ভাব গলাতে।
"হ্যাঁ উঠেছি। কাপড়-জামা পরছি।" মহিলাটি জল, মুখ ধোবার জিনিসপত্র সব পাশের ঘরে রেখে গেল।
"কি রকম? মেয়েটি ভালো?"
"হ্যাঁ, খুব ভালো। ও কখন উঠবে?"
"জানি না।"
"ও না ওঠা পর্যন্ত আমি থাকতে পারি?"
"না তা কিছুতেই সম্ভব নয়।
"মেয়েটি বড় ভালো।"
"সেইজন্যেই তো আপনার চলে যাওয়া উচিত। যাতে ও কোনো

দিন জানতে না পারে যে আপনার সঙ্গে ও রাত কাটিয়েছে।”

“কিন্তু আমি তো ওকে জেনেছি। আমার ওকে মনে থাকবে। যদি পথে কোনোদিন দেখা হয়ে যায়?”

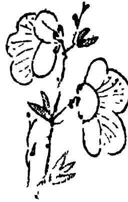
“তা হলেও ওর সঙ্গে কথা বলাটা হবে পরম অন্যায়, অপরাধ।”

“অপরাধ?”

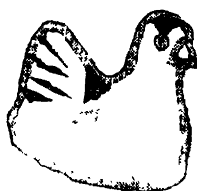
“নিশ্চয়।”

“আমি আপনাকে অনুরোধ করব একে ঘুমন্ত মেয়ে হিসাবে ধরতে।”

বাইরে তখন পাহাড়ের চূড়ায় ভোরের আলোর ছোঁয়া লেগেছে।



৩



দ্বিতীয়বার যাবার আটদিন পরে এগুচি আবার ঘুমন্ত সুন্দরী-দের পুরীতে গেল। এবারের যাওয়াটা একটু তাড়াতাড়ি। ঘুমন্ত রূপসীরা যেন তাকে টানতে শুরু করেছে।

"আজকেরটি এখনও শিক্ষানবীশ।"

"আজ আবার আর একজন নতুন ?"

"আপনি আসবার আগেই জানালেন কাজেই আমার হাতে যা আছে। তাই নিয়েই চালাতে হবে তো। যদি বিশেষ কারুকে দরকার থাকে, তাহলে আসবার অন্তত দুতিন দিন আগে জানাতে হবে।"

"তা না হয় হল। কিন্তু ও ট্রেনিংয়ে আছে এ কথাটার মানে ?"

"ও ছেলেমানুষ ও একেবারে নতুন।" বৃদ্ধ এগুচি কথাটা শুনে চমকে উঠল।

"ও ভয় পাচ্ছিল। বললে, আর একজন কেউ ওর সঙ্গে থাকলে ভালো হয়। কিন্তু আপনি আবার যদি কিছু মনে করেন।"

"দুজন মন্দ নয়। কিন্তু ও তো মরার মতো ঘুমিয়ে থাকবে। কাজেই ভয়তো টেরই পাবে না।"

"সে কথা ঠিক। কিন্তু ওর তো অভ্যাস নেই। তাই ওর সম্পর্কে একট অনুকম্পা দরকার।"

"আমি কিছুই করব না।"

"তা জানি।"

"আপনার ইচ্ছে হলেই," মহিলাটি এগুচিকে বলে চ'লে গেল।

এগুচি আর এক কাপ চা খেল।

ছোট মেয়েটি। মুখখানিও ছোট। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। যেন খোঁপাটা খুলে গেছে। শিশুর মতো ঘুমচ্ছিল। মুখে কোনো প্রসাধনের ছাপ নেই। এগুচি তাকে না ছুঁয়ে তার পাশে শুয়ে পড়ল। তার শরীরের উত্তাপের স্পর্শ এগুচির দেহেও লাগল। কিন্তু সে উত্তাপ ইলেকট্রিক কম্বলের উত্তাপের মতো নয়।

"বছর ষোল হবে বড় জোর". এগুচি মনে মনে বললে।

যে সব বৃদ্ধরা এ বাড়িতে আসে, তারা মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের মতো ব্যবহার করতে পারে না। এ রকম মেয়ের ঘুমন্ত দেহে যে বিষণ্নতা, মৃত্যু পিপাসু বৃদ্ধদেব পক্ষে তা উপভোগ্য। তারা শুধু তাদের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দিয়ে এই তরুণীদের যৌবন পান করে।

বালিশের পাশে যথারীতি দুটি ঘুমের বড়ি। কি বড়ি লেখা নেই। বড়ি খেয়ে মৃত্যুর মতো এক অন্তহীন, অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে

পড়তে যেন এগুচির বাসনা হয়।

মৃত্যুর মতো ঘুম, এই কথাটা মনে হতেই কোবের হোটেলে একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। বছর তিনেক আগে এগুচি কোবেতে তার হোটেলে একটি মেয়েকে নিয়ে এসেছিল। তখন রাত বারোটার বেশী। মেয়েটি নাইট ক্লাবের। বোতলে হুইস্কি রাখা ছিল। সে খেল। মেয়েটাকেও দিল। মেয়েটা তার চেয়ে কম খেল না। এগুচি জামা কাপড় ছেড়ে তার রাতের কিমনো পরল। মেয়েটির কাপড় ছেড়ে পরবার মতো কিছু ছিল না।

"এ পরে আমি ঘুমতে পারব না। এই বলে মেয়েটা সব জামা কাপড় আয়নার সামনের চেয়ারটায় খুলে ফেললে।"

যারা নতুন, তারাই এ রকম হয়। এগুচি মনে মনে বললে। এগুচি যেন এতটার জন্য তৈরি ছিল না। তা ছাড়া বুড়ো মানুষের পেটে হুইস্কি পড়লে ঘুমও এসে যায়। মেয়েটি বললে, "তুমি আমাকে ঠকিয়েছ মিঃ এগুচি।"

সকালে মেয়েটি বিছানা থেকে উঠে গেছে এই রকম অনুভূতি হতে এগুচির ঘুম ভেঙে গেল। মেয়েটি আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে।

"এত সকাল যে?"

"কারণ আমার ছেলেরা আছে।"

"ছেলে?"

"হ্যাঁ। দুজন। খুব ছোট তারা।"

ও বিছানা ছেড়ে ওঠবার আগেই মেয়েটি চলে গেল।

এগুচির আশ্চর্য বোধ হতে লাগল। এমন পাতলা-পাতলা টাইট গড়ন, কাল রাতের বেশীর ভাগ কেটেছে যা আলিঙ্গন করে।

আর অমন বুক ! দুটি শিশু সেই স্তন পান করেছে ?

পরিষ্কার একটা শার্ট বার করবার জন্য সে স্যুটকেসটা খুললে। স্যুটকেসটা পর্যন্ত চমৎকার করে গুছিয়ে সে রেখে গেছে। গত দশদিনে কোবেতে যত জিনিস ময়লা হয়েছে, এলোমেলো করে সেগুলো সে স্যুটকেসের ভিতর ঢুকিয়েছে। স্যুটকেসটা যার ফলে বন্ধই হচ্ছিল না। মেয়েটি স্যুটকেসের অবস্থাটা দেখতে পেয়েছিল। যখন এগুচি এলোমেলো হাতড়ে সিগারেট খুঁজছিল। ময়লা কাপড় চোপড়গুলো পাট করে আলাদা রাখা। কোনো মেয়ের অভ্যস্ত হাতেও এ কাজগুলোতে সময় লেগেছে। নিশ্চয় এগুচি ঘুমিয়ে পড়বার পর এ কাজগুলো সে করেছে। কিন্তু কেন ?

পরের দিন কথামতো মেয়েটি একটা জাপানী রেস্তোরাঁতে তার সঙ্গে দেখা করলে। পরনে জাপানী কিমনো।

"তুমি কিমনো পর ?"

"মাঝে মাঝে। তবে পরলে বোধহয় আমায় ভালো দেখায় না। আজ দুপুরে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। ও জিজ্ঞাসা করলে। কি ব্যাপার ?"

"ওকে বললে ?"

"হ্যাঁ, আমি ঢাকঢাক গুড়গুড় কিছু রাখি না।"

ওরা বেড়াতে গেল। এগুচি ওকে কিছু জিনিসপত্র, একটা কিমনোর কাপড়, এই সব কিনে দিয়ে ওরা হোটেলে ফিরে গেল। সেখান থেকে খোলা জানলা দিয়ে ওরা বন্দরের আলো দেখতে লাগল। হুইস্কি কিছুতেই সে খেল না। পরদিন প্রায় এগুচির সঙ্গে একসঙ্গে সে উঠল। উঠে বললে, "আমি কাল মরা মানুষের মতো ঘুমিয়েছি।"

ও জানত, এগুচি আজ টোকিওতে ফিরে যাচ্ছে। ওর স্বামী, যখন একটি বিদেশী কোম্পানীর কোবে অফিসে কাজ করছিল, তখনই ওদের বিয়ে হয়। সে গত দু বছর সিঙ্গাপুরে আছে। আগামী মাসে ফিরবে। সব কথা গত রাতে সে এগুচিকে বলেছে, এগুচি জানত না যে তার একজন বিদেশীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। নাইটক্লাব থেকে খুব সহজেই ওকে নিয়ে আসতে পেরেছিল। তার পাশের টেবিলে দুজন ইউরোপীয় ও চারজন জাপানী মহিলা ছিল। তাদের মধ্যে মধ্য-বয়সী এক মহিলা এগুচির পরিচিতা। তিনি গাইড হিসাবে কাজ করেন। দুজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক নাচতে উঠল। তখন ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, এগুচি তরুণী জাপানী মেয়েটির সঙ্গে নাচতে চায় কিনা। দ্বিতীয় নাচের মাঝখানে এগুচি জিজ্ঞাসা করতেই মেয়েটি হোটেলে আসতে রাজি হয়ে গেল; যেন এক নিষিদ্ধ ফলের লোভে।

এমনি করেই একজন বিবাহিতা বিদেশী ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। ছেলে দুটিকে গভর্নেসের কাছে রেখে মেয়েটি বেরিয়েছিল। মেয়েটির দিক থেকে কোনো বাধাই যেন ছিল না। তবু সমস্ত ব্যাপারটা জানবার পর এগুচির মধ্যে একটা অপরাধবোধ জাগছিল। "আমি মড়ার মতো ঘুমিয়েছি", এই কথাটা যেন তারুণ্যের সঙ্গীতের মতো তার মনের মধ্যে রয়ে গেল। তখন এগুচির বয়স ছিল চৌষট্টি। আর মেয়েটি তিরিশেরও নিচে। বয়সের তফাতের কথা ভেবে এগুচি মনে করেছিল যে কোনো তরুণীর সঙ্গে এই তার শেষ যোগাযোগ। এই দুটি রাত্রেই সেই মেয়েটির কথা আর সে ভুলতে পারছিল না। কিছুদিন পরে আবার কোবেতে আসার সময় সেই মেয়েটির কাছ থেকে সে একটা চিঠি

পেয়ে জানতে পারলে যে তার স্বামী ফিরে এসেছে। তা সত্ত্বেও মেয়েটি তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। তার একমাস পরে ঠিক তেমনি আর একখানা চিঠি এসেছিল। সেই শেষ।

তিন বছর পরে ছেলেমানুষ এই মেয়েটির পাশে শুয়ে, বিশেষ করে মেয়েটির এই মরার মতো ঘুম তাকে কোবের সেই মেয়েটির কথা মনেকরিয়ে দিলে। এগুচির ধারণা আবার সন্তান সম্ভাবনার জন্যই হয়ত মেয়েটি চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিল। আর সন্তান সম্ভাবনা সব গ্লানিই মুছিয়ে দেয়।

পাশের এই মেয়ে ঘুমন্ত সুন্দরী হবার ট্রেনিং পাচ্ছে। অবশ্য এর চেয়ে অল্প বয়সের মেয়েকেও সে গণিকাবৃত্তি করতে দেখেছে। অনেক-দিন আগে এই রকম একটি মেয়ের কথা তার মনে পড়ল। ছেলে-মানুষ মেয়েটা। নিজের খদ্দেরের দিকে তার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। দূর থেকে বাজনার শব্দ আসছিল, কিসের যেন একটা উৎসব সেদিন।

মেয়েটির দিকে চেয়ে এগুচি বললে, "তোমার বোধহয় ওই উৎসবে যাবার জন্যে মনটা ছটফট করছে।"

"ঠিকই। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ওখানে যাবার কথা ছিল, এমন সময় এখানে আসতে হল।"

"বেশ তো। এখনই যাও। তোমার বয়স কত?"

"চোদ্দ।"

মেয়েটা তাড়াতাড়ি করে চলে গেল। এগুচি সিগারেট ধরালে। এগুচির তখন কত বয়স ছিল, তা তার মনে পড়ল না। সে মেয়ে-টির সঙ্গে আজকের মেয়েটির তফাৎ এই যে যত উৎসবের বাজনাই বাজুক ওর ঘুম ভাঙবে না।

কান খাড়া করেও এগুচি আর কোনো শব্দ শুনতে পেল না। একমাত্র শব্দ পাশের মেয়েটির শ্বাস প্রশ্বাস। উপর থেকে কার কতটুকুই বা বোঝা যায়। উপর থেকে দেখা যায়, বিয়ে-ছেলে-মেয়ে-সংসার। আর অন্যায়? এই মেয়েটির পাশে তার শুয়ে থাকা এ কি অন্যায় নয়? আর এই নিরপরাধ মেয়েটিকে গলা টিপে যদি সে মেরে ফেলে? তাহলে তা কত বড় অপরাধ হবে?

বৃদ্ধ কিগা, যে এগুচিকে এখানের সঙ্গে পরিচিত করেছিল, এখানের অন্য অতিথিদের কথা সে কিছুই বলে নি। কিন্তু এগুচি বুঝতেই পারে তাদের সংখ্যা অল্প। সকলেরই পার্থিব সাফল্য, অর্থ, প্রতি-পত্তি আছে। আর আছে বিগত যৌবনের প্রতি আকর্ষণের মোহ। তাদের সামনে নেই প্রশান্ত বুদ্ধের মূর্তি। তা হলে তাঁর কাছেই তারা আত্মনিবেদন করতে পারত। কিন্তু এই ঘুমন্ত সুন্দরী এ তো বুদ্ধেরই মূর্তি। এর যৌবনই বৃদ্ধদের প্রতি তাঁর ক্ষমা।

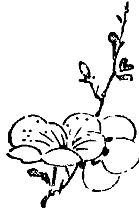
মেয়েটির অনুকম্পায় এগুচি ভাবতে লাগল: কে জানে মেয়েটির কি ভবিষ্যৎ? বড় রকমের কিছু না হলেও মেয়েটা যেন সুখী হয়। কে জানে এমনও তো হতে পারে যে এই প্রসুপ্ত সুন্দরী ভগবান বুদ্ধেরই এক জন্ম। জাতকের গল্পে তো এ রকম আছে। এই মেয়েটির এলো চুল স্পর্শ করে, নিজের জীবনের সব পাপ স্বীকার করবার অদম্য বাসনা এগুচির মনে জাগল।

এগুচি এতক্ষণ পর্যন্ত ঘুমের বড়ি খায় নি। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সে দেখল, সাড়ে বারোটা। আজ না হয় নাই ঘুম হল।

হঠাৎ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে এগুচির মনে হল, ওর বোধহয় ঠাণ্ডা লাগছে। ভালো করে সে ওকে ইলেকট্রিক কম্বলটায় ঢাকা দিয়ে দিলে।

পরদিন সকালে মহিলাটি প্রাতরাশ নিয়ে এলে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কাল রাত্রে আমি বেল বাজিয়েছিলাম, শুনতে পান নি ? মেয়ে-গুলিকে যে ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়। আমি সেই ওষুধ চাইছিলাম।"

"বুড়োমানুষদের পক্ষে ও ওষুধে বিপদ আছে। আর তা ছাড়া, আপনি একটু বেশী চাইছেন না কি ?"



৪



ঘোলাটে শীতের আকাশ। আবার তার উপর বৃষ্টি শুরু হল। এগুচি যখন প্রসুপ্ত রূপসীদের নিকেতনে পৌঁছল তখন, বৃষ্টির জল জমে বরফ হয়ে গেছে।

"সাবধান। পাথরগুলো ভিজে।" মহিলাটি এগুচিকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

"আমি এখনও এত বুড়ো হয় নি যে হাত ধরে আমায় নিয়ে যেতে হবে।"

"পিছল বলে।"

"আর সবাইকে ধরে নিয়ে যেতে হয়?"

"অন্যের কথা থাক।"

"যদি কারুর হার্ট এট্যাক হয়েযায় ? এত শীত বৃদ্ধদের পক্ষে তো ভালো নয়।"

"তা হলে তো চুকেই গেল।"

মহিলাটি উদাসীন ভাবে বললে, "সে তো তাদের স্বর্গ।"

"আপনাদেরও তাতে ক্ষতি, কি হাঙ্গামা কম হবে না।"

মহিলাটির উদাসীন মুখের যেন সামান্য একটু ভাবান্তর হল।

"আপনি সব সময় এত কম নোটিশ দিয়ে আসেন !" চা তৈরি করতে করতে মহিলাটি বললে।

"আচ্ছা এই মেয়েরা উঠে জিজ্ঞাসা করে না, কি রকম লোক তাদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে গেছে ?"

"সেটা ওদের পক্ষে নিষিদ্ধ। কাজেই তা নিয়ে চিন্তা করার কারণ নেই।"

"মনে আছে একবার আপনিই বলেছিলেন, যে কোনো একজন বিশেষ মেয়েকে পছন্দ করলে বেশী অসুবিধা ?"

মহিলাটির মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। তারপর সে বললে, "আপনি অনেক মেয়ের চোখের জলের কারণ হয়েছেন বোধহয়।"

"কেন ?"

"আপনার সবেতেই আপত্তি।" তারপর একটু থেমে এগুচি আবার বললে, "আচ্ছা এখানে সব চেয়ে খারাপ কি করা সম্ভব ?"

"কেন এ রকম কথা জিজ্ঞাসা করছেন ? অবশ্য এরকম ঘুমন্ত মেয়ের গলা টিপে কেউ মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু সেটা কি শিশু হত্যার মতো বীভৎস হবে না ?"

"আর কেউ যদি এইখানে আত্মহত্যা করতে চায় ?"

"আচ্ছা আপনি কি মদ্যপান-টান করে এসেছেন? কথাগুলোর মধ্যে যেন সঙ্গতির অভাব।"

মহিলাটি চলে গেল। সেই ধারে একটি মেয়ে শুয়ে। পিছনটা এগুচির দিকে। মেয়েটি বেশ বড়সড়। সে এসে মেয়েটির পাশে শুয়ে পড়ল। এত বড় দেখতে মেয়েটা, এতখানি তার শরীর। তাকে যেন পুতুল করে রাখা হয়েছে।

কে জানে এ মেয়েটির ট্রেনিং কতদূর হয়েছে? কেমন তার মনে হতে লাগল যে এ মেয়েটি হয়ত কুমারী নয়। হাত দিয়ে কম্বল সরিয়ে মুখখানিকে তুলে ধরতে যেন মনে হল মুখখানি বড় নিরপরাধ। নগ্ন, সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়েটি। এগুচির মনটা নরম হয়ে এলো, আহা, বেচারীর কোনো দিক থেকে, আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই। এ মেয়েটিও নিশ্চয় কুমারী। আর তাতে এগুচির কি? মনে আছে দ্বিতীয় মেয়েটির সম্পর্কে তার এক সন্দেহ জেগে ছিল। তার সেই জন্য নিজের চোখে সরজমিন পরখ করার মতো অসঙ্গত কৌতূহলও সে দমন করে নি। মেয়েটি হঠাৎ যদি চোখ খুলত, তা হলে সে কি লজ্জাতেই না পড়ে যেত।

নিজের যেটুকু শেষ বয়সের পৌরুষ অবশিষ্ট আছে তাও চলে যেতে দেরী নেই। এই কথা মনে হতে এগুচির মনে হল, এই বাড়ি এই মেয়েটা এখানকার গৃহকর্ত্রী এমনকি নিজেকেও একসঙ্গে ধ্বংস করে দেয়। সে চোখ বুজে থাকতে থাকতে মনে হল যেন ধরে দুটি অপূর্ব রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। বাইরে বৃষ্টির জল জমে বরফ হয়ে গেছে সে দেখে এসেছিল। তবে কেন এই প্রজাপতি? সে কি মেয়েটির স্তন দুটির আকর্ষণে? এগুচি চোখ খুলল।

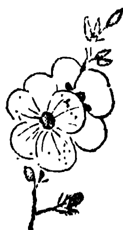
"নটা বেজে গেছে স্যার।"

"উঠছি।"

"আপনার খাবার তৈরি।"

"একটি অনুরোধ। প্রাতরাশ সারার পর আমাকে আর একবার ঘুমের ওষুধ দিতে হবে। এবার না হয় আমি ঘুমিয়ে থাকব, মেয়েটি যখন উঠে যাবে।"

"এ অনুরোধ রাখা যাবে না। বাড়াবাড়ি করবার চেষ্টা করবেন না।"



৫



শীতে সমুদ্র শান্ত। নতুন বছর এলো।

"ভালোই আপনি যে এমন শীতের রাতে এলেন।" সেই মহিলাটিই যথারীতি দোর খুলল।

"সেই জন্যেই তো আসা! এমন শীতের দিন একটি তরুণীর পাশে শুয়ে মরতে পারা, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য একজন বৃদ্ধের আর কি হতে পারে?"

"আপনার কথাগুলি বড় সুন্দর," এগুচির কথা শুনে সেই মহিলাটি বললে।

উপরের ঘরে স্টোভ জ্বলছিল। চাও যথানিয়মেই ভালো হলো।

"আচ্ছা এ বাড়িতে ভূত আছে?"

মহিলাটি চমকে ওর মুখের দিকে তাকাল। মুখখানা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

"আর একটু চা দিন তো, খুব গরম গরম।"

চা দিয়ে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কিছু শুনেছেন ?"

"হয়ত।"

"শুনেও যে এসেছেন ?" হয়ত এগুচি জানে, এই ভেবে মহিলাটি গোপন করবার চেষ্টা করলে না।

"আমি তো জেনেশুনেই এসেছি।"

মহিলাটি শুধু হাসল। বিচিত্র হাসি।

"এটা তো আশ্চর্য নয়। বুড়ো মানুষদের শীতকালটা ভালো নয়। হয়তো শীতের সময় আপনাদের বন্ধ রাখাই উচিত।

মহিলাটি নিরুত্তর।

"জানি না কি রকমের বৃদ্ধরা এখানে আসেন, কিন্তু এরকম আরো দু একজন যদি মারা যান, তা হলে আপনাদের বিপদ।"

"এখানের যে মালিক, তাকে বলুন। আমার কি অপরাধ ?" ভদ্রমহিলার মুখটা একেবারে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে দেখাল।

"কিন্তু আপনারও কিছু দোষ ছিল। রাতের অন্ধকারে তার মৃতদেহটাকে যখন এখান থেকে সরিয়ে সরাইখানায় নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আপনারও সাহায্য ছিল।"

দু হাত দিয়ে নিজের হাঁটুটা চেপে ধরে সে বললে, "এ তো তাঁরই জন্যে। তাঁরই সুনামের জন্যে।"

"মরার আবার সুনাম দুর্নাম। না আপনার কথাই ঠিক। মৃতের পারিবারিক সুনামের কথাটাতো আছে। আচ্ছা এ জায়গার যে মালিক, ও সরাইখানাটাও কি তারই ?"

মহিলাটি কোনো উত্তর দিল না।
"আমি কিন্তু এখানেই মরে থাকাটা পছন্দ করতাম।"
"তাতে প্রশ্ন উঠত। তদন্ত হতো। আমাদের এখানে অন্য যে ভদ্রলোকরা আসেন, তাঁদেরও হয়তো জিজ্ঞাসাবাদ করত। তা ছাড়া ওই মেয়েগুলোও আছে।"
খবরের কাগজে অবশ্য আকস্মিক মৃত্যু বলেই দিয়েছিল। মৃত্যুর কারণও ছিল হার্টফেল। কিন্তু কিগার কাছে আসল ব্যাপারটা এগুচি শুনেছিল। ব্যাপারটা একরকমের ইচ্ছা মৃত্যু। কিগার সঙ্গে সেই খ্যাতনামা কোম্পানীর ডিরেকটারের ঘনিষ্ঠতা ছিল যথেষ্টই। তাই এক সে ছাড়া কেউ কিছু জানল না। এমনকি তার পরিবারের লোকেরাও না।
এগুচিকে কিগা বললে, "তুমিও সাবধান।"
কিগা আরো বললে, "এ ব্যাপারটা অবশ্য মিটে গেল। কিন্তু এ রকম ঘটনা আরো ঘটলে ও আড্ডাটা আর টিকবে না।"
ফুকুরাব মৃত্যুর কথা এগুচি সব জানতে পেরেছে। তাই মহিলাটি তার কাছে আর কিছু গোপন করলে না। এমনকি তার ভারী দেহটা গাড়িতে করে নিয়ে যেতে যে বেশ কষ্ট হয়েছিল, তা অবধি। উষ্ণ প্রস্রবণের ধারে সরাইখানা, ছোট হোটেল বললেই হয়। এগুচি বেশ কল্পনা করতে পারে সেইখানে চুপি চুপি মৃত দেহটা নিয়ে যাওয়া গাড়িতে, ঢাকা ঢুকি দিয়ে।
"মরলে বলে স্বর্গে যায়। কিন্তু ফুকুরা যে তা যায় নি, এটা বোঝা যায়।" এগুচির কথা শুনে মহিলাটি চুপ করে রইল।
"এ ব্যাপারটা মিটে গেছে। কিন্তু আর বেশীদিন কি আপনারা চালিয়ে যেতে পারবেন?" এগুচি আবার প্রশ্ন করল।

মহিলাটি চুপ করে থাকতে দেখে এগুচি আবার প্রশ্ন করল, "ও যে মারা গেছেন কি করে জানতে পারলেন ?"

"একটা কাতরানির আওয়াজ শুনে উপরে এসে দেখলাম নাড়ী নেই, নিশ্বাস বন্ধ।"

"মেয়েটা জানতেও পারলে না। কি সাংঘাতিক।"

"কেন সাংঘাতিক কেন ?"

"বৃদ্ধের কাছে হয়ত যৌবনই সাংঘাতিক।"

চলে যাবার সময় মহিলাটি এগুচিকে বললে, "হ্যাঁ ওরা দুজন আছে।"

এগুচি চমকে উঠল। মহিলাটি চলে গেল। আজও তা হলে একজন শিক্ষানবীশ। এগুচি ঘরে ঢুকল। মেয়েটি লম্বা, কপালে যেন বিন্দু বিন্দু ঘাম, রুমাল দিয়ে সে ঘাম মুছে নিল। এ রুমালখানা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যাবে না। রুমালখানা বিছানাতেই সে রেখে দিল। ঠোঁটে লিপস্টিক। ওই রুমাল দিয়ে মুছে দেবে নাকি ? লিপস্টিকের কথায় মনে পড়ল। চুম্বন ? চুম্বন এখানেও নিষিদ্ধ নয়।

নড়া চড়ায় মেয়েটির স্তন দুটি কম্বলের বাইরে এসে গিয়েছিল। যত্ন করে সে ঢাকা দিয়ে মনে মনে বললে, "যতই রক্তের তেজ থাক, ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।।"

কাপড় জামা ছেড়ে সে শুয়ে পড়ল। মেয়েটি পাশ ফিরল, এগুচির একপাশে ঠেলে দিলে যেন। বেশ জোরালো মেয়ে তো। এগুচি মনে মনে ভাবল, কয়েকবার এসে এগুচি ক্রমশ সুসুপ্ত রূপসীদের সম্বন্ধে ক্রমে উদাসীন হয়ে উঠছিল।

এবার সে অন্য মেয়েটির দিকে নজর দিল। আজ একেবারে মাণিক-জোড়। এ মেয়েটিও পাতলা পাতলা, লম্বা। কিন্তু এরা প্রাচীন

জাপান থেকে অন্যরকম, সব কিছুতেই। এও কম্বলটা সরিয়ে ফেলেছে, একটা পা কম্বল থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। স্তনের কাছে বুকের উপর কান ঠেকিয়ে সে এ মেয়েটির হৃদস্পন্দন শুনল। সে আশা করেছিল একেবারে গুম গুম করে আওয়াজ শুনতে পাবে। কিন্তু তা তো নয়, যেন শব্দটা আস্তে। কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কি ?

পাছে ঠাণ্ডা লাগে তাই সে ভালো করে ঢেকে দিল মেয়েটাকে। একবার সে নিজের বুকে হাত দিলে। তারটাই বেশী জোর।

আমি এর কাছ থেকে ক্ষমা চাইব, আমার জীবনে শেষ যে মেয়েটি ! এগুচি ভাবতে লাগল। এই মেয়েরা ঘুমিয়ে রয়েছে ওষুধে, বিষই এক রকমের। কিন্তু কেন? পয়সার জন্যেই নয় কি ? মরার থেকে এদের তফাৎ কতটুকু ? শুধু এদের হৃদস্পন্দন আছে, রক্ত তরল, শরীরে উত্তাপ আছে। এখন এদের ভয় নেই, লজ্জা নেই, ভালো-বাসা নেই। জেগে উঠে ও জানবে না যে এক বৃদ্ধ ওর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। ঘুমের ওষুষটা খুঁজল এগুচি। তুজনের মধ্যিখানে বেশী জায়গা নেই, সেইটুকুতে নড়াচড়া করা শক্ত।

বহুবার এখানের মেয়েদের যে ওষুধ দেওয়া হয়, এগুচি তাই চেয়েছে। এখানের মহিলাটি তাকে বলেছে যে এ ওষুধ বৃদ্ধদের পক্ষে বিপদ-জনক হতে পারে। এখানে এই তুটি মেয়ের মাঝখানে শুয়ে যদি তার মৃত্যু হয়, তা হলে নিজের পরিবারে কি তার সম্মান মারাত্মক ভাবে ক্ষুণ্ণ হবে না ? অথচ এই ভাবে মারা যাওয়ার চেয়ে, একজন বৃদ্ধের আর কি কাম্য হতে পারে? তা যদি ঘটে তাহলে তাকেও ফুকুরার মতে উষ্ণ প্রস্রবণের ধারের সরাইখানায় নিয়ে যাবে। হয়তো লোকে জানবে বেশী পরিমাণে ঘুমের বড়ি খেয়ে সে আত্মহত্যা

করেছে।

ছুটি মেয়ের মধ্যে যেটি একটু ময়লা যেন মুখে কি একটা শব্দ করলে। কে জানে, ওর কি কোনো কষ্ট হচ্ছে? একেই তো সে তার জীবনের শেষ নারী বলছিল না ? আর প্রথম? মা, তার মা। ঘুমের ওষুধের কাজ শুরু হয়েছিল। সে তার মার কথা মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল।

এগুচির যখন বয়স সতেরো বছর, তখন তার মা মারা যান। মারা যাবার মুহূর্তে তার মার হাতখানি ধরে তার বাবা বসেছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি টিউবারকুলোসিল রোগে ভুগছিলেন। হঠাৎ তার মা যেন হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন তার নামটা। এগুচি এসে তার বুকের উপর হাত রাখল। তখনি তার মার রক্তবমন হলো, ব্যস্, সব শেষ।

এগুচি যখন তার জীবনের প্রথম নারী হিসাবে তার মার কথা ভাবছিল, তখন তার মৃত্যুর কথাও স্বাভাবিক ভাবেই তার মনে পড়ল।

ঘুমে তখন তার চোখ জড়িয়ে আসছে। জীবনের প্রথম নারী ? তার স্ত্রী নয় কি ? বেচারীর তিনটি মেয়ের এখন বিয়ে হয়ে গেছে। আজ এই শীতের রাত্রে সে বেচারী একা ঘুমাচ্ছে। নাকি এখনও সে জেগে আছে ? ওখানে শীতটা আরো বেশী।

ময়লা মেয়েটির দিকে ফিরে এগুচি ঘুমিয়ে পড়ল।

বোধহয় ছুটি মেয়ের মধ্যিখানে শুয়ে এগুচির আরাম হচ্ছিল না। তাই পর পর অনেক দুঃস্বপ্ন দেখল সে। সেই স্বপ্নের মধ্যে এগুচির মা, তার স্ত্রী ও আরো অনেকেই ছিল।

কাতরাণির শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। তখনও তার ঘোর কাটে

নি। ময়লা মেয়েটির দিকে ফিরে সে শুয়েছিল, ওর শরীরটা ঠাণ্ডা এগুচি চমকে উঠল। ওর নিশ্বাস পড়ছে না, বুকে হাত দিয়ে দেখল হৃদস্পন্দন নেই। এগুচি লাফিয়ে উঠল, মাথা ঘুরে সে একবার পড়েও গেল। কাঁপতে কাঁপতে সে পাশের ঘরে গেল। কলিংবেলটা দেখতে পেল সে।

"আমিই কি ঘুমন্ত মেরে ফেললাম মেয়েটিকে?" আবার সে ছুটে শোবার ঘরে এলো।

"কি হয়েছে?" সেই মহিলাটি ঘরে ঢুকল।

"ও মারা গেছে !!!"

"সে কি? তা কি করে সম্ভব?"

"হ্যাঁ মারা গেছে। নাড়ী নেই, নিশ্বাস পড়ছে না।"

মহিলাটি মেয়েটির পাশে বসে পড়ল। "আপনি কিছু করেছিলেন?"

"কিছু না।"

"না ও মরে নি," মুখের উপর জোর করে একটা শান্ত ভাব টেনে আনবার চেষ্টা করে মহিলাটি বললে, "আপনাকে ভাবতে হবে না।"

"ও মারা গেছে, ডাক্তার ডাকুন।"

মহিলাটি কোনো কথা বললে না।

"ওকে কি দেওয়া হয়েছিল? হয়ত ওর এলার্জি ছিল।"

"কোনো ভয় নেই। আমরা আপনাকে কোনো বিপদে ফেলব না। আপনার নামও বলব না।"

"ও মারা গেছে।"

"নাও হতে পারে।"

"কটা বাজল?"

"চারটে বেজে গেছে।"
একা মহিলাটি শরীরটা তুলতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।
"আমি ধরছি।"
"দরকার নেই। নিচে লোক আছে।"
"ওর শরীরটাতো ভারী।"
"দয়া করে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আপনি শুয়ে পড়ুন। কেন ওই মেয়েটা তো রয়েছে।"
ওই মেয়েটাতো রয়েছে? কথাটা যেন এগুচির গালে ঠাস করে একটা চড় মারল।
"এর পরেও আমি ঘুমাব, এটা সম্ভব?" তার কথার সুরে বেশ রাগ ছিল। "আমি বাড়ি চললাম।"
"দয়া করে তা করবেন না। এমন সময় বার হলে নজরে পড়া স্বাভাবিক।"
"কিন্তু এর পর ঘুমনো সম্ভব নয়।"
"আমি ওষুধ এনে দিচ্ছি।"
সিঁড়ি দিয়ে মৃতদেহটা নিয়ে নেমে যাবার শব্দ এগুচি শুনতে পেল।
"এই যে ঘুমের ওষুধ। কাল দেরী করে উঠবেন।"
পাশের ঘরের দরজাটা খুলে সে দেখতে পেল গায়ের চাপাটাপা-গুলো, এই সব গণ্ডগোলে পড়ে গিয়েছে, আর খাটের উপর সম্পূর্ণ নগ্ন শুয়ে সেই সুন্দরী মেয়েটি। ওর নগ্ন দেহটা ঝলমল করছে।
সে ওই দিকে তাকাল।
নিচে একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। ওরা মেয়েটির মৃতদেহটা নিয়ে যাচ্ছে, বোধহয় যেখানে ফুকুরাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

---

* "সুই নে রু উজকুপি অন্না" গল্পের অনুবাদ।



তিল

কাল রাতে আবার সেই তিলটির স্বপ্ন দেখলাম।

হ্যাঁ তিল। শুধু কথাটা লিখলেই বুঝতে পারবে। মনে আছে তো, কত বকুনিই না তোমার কাছে খেয়েছি ওটার জন্যে।

ওটা আছে আমার বাঁ কাধে কিংবা বোধহয় বলা উচিত পিঠের উপরেই—একটু উঁচুতে।

"বেশ তো একটা শিমের বিচির মতো বড় হয়ে উঠেছে; ওটার পিছনে আরও লাগো, তারপর আরও ভালো করে শিকড় গজাতে শুরু করুক।"

তুমি এই সব বলে আমাকে বকতে। তুমি বলতে, তিল হিসাবে এটা একটু বেশি বড়; কিন্তু চমৎকার গোল, আর একটু উঁচু।

যখন আমি ছোট ছিলাম, বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই তিলটা নিয়ে কত খেলা করেছি। মনে আছে, তুমি যেদিন ওটাকে প্রথম দেখলে, কি লজ্জাই না পেয়েছিলাম।

এমন কি আমি তো কেঁদেই ফেলেছিলাম। মনে আছে, তুমি কি রকম অবাক হয়ে গিয়েছিলে।

"কি হচ্ছে সায়োকো, থামো দিকি। যত ওটাতে হাত দেবে, তত বড় হয়ে যাবে।" আমার মাও আমাকে বকতেন। আমি তখন একেবারে ছোট। তারপর থেকে অভ্যাসটা আমি রাখলাম, একে-বারে নিজের একান্ত করে। মার বকুনিটা ভুলে গেলাম, কিন্তু অভ্যাসটা থেকে গেল।

তুমি যখন ওটা প্রথম দেখলে, তখন তোমার স্ত্রী হয়েও আমি যেন শিশু হয়ে গেলাম। [illegible]পুরুষমানুষ; আমার কী যে লজ্জা করেছিল, তা হয়ত তুমি বুঝতে পারবে না। না, লজ্জার চেয়েও ভয়ই বেশি। তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা যেন একটা মারাত্মক ব্যাপার বলে মনে হল।

মনে হল, বুঝি আমার গোপন কিংবা নিজস্ব বলতে কিছুই রইল না—রইল না আর সামান্যতম আশ্রয়।

তুমি তো দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লে। মাঝে মাঝে একটু নিশ্চিন্ত বোধ হচ্ছিল; কিন্তু যেই হাতটা তিলটার দিকে অতর্কিতে এগোচ্ছিল, আমি যেন চমকে উঠছিলাম।

"আচ্ছা, আমি আর আমার তিলটাতে হাত দিতেও পারব না?" ভাবলাম আমার মাকে লিখব; কিন্তু সে কথা মনে হওয়া মাত্র নিজেই অনুভব করতে পারছিলাম, আমার মুখখানা যেন লাল হয়ে তেতে উঠছে।

"একটা তিলের জন্যে এত মাথা ঘামাবার কি আছে?"—তুমি একদিন বলেছিলে। শুনে আমি খুশিই হয়েছিলাম। এমন কি মাথাও নেড়েছিলাম। কিন্তু আজ মনে হয় নিজের এই বদ অভ্যাসটার ওপর আমার আর একটু দরদ থাকলে ভালো হত।

তিলটার জন্যেও বেশি চিন্তা আমার ছিল না। মেয়েমানুষের গলার নিচে তিল আছে কি না, তা তো আর কেউ উঁকি মেরে দেখতে যায় না। কখনো কখনো মনে হত সেই চলতি কথায় যাকে বলে "বন্ধ ঘরের মতো, অসূর্য্যম্পশ্যা"—মেয়েদের সম্পর্কে ব্যবহার হয় যে কথাটা—সেই যে যাদের শরীরে কোনো ত্রুটি আছে তাদের সম্পর্কে। অবশ্য একটা তিলকে কিছু বিকলাঙ্গ বলা চলে না নিশ্চয়।

আচ্ছা বলতো, তিলটা নিয়ে খেলা করার অভ্যাস আমার কি করে হল?

আর তুমিই বা এর জন্যে এত রাগ করলে কেন?

"থাম দিকি নি," তুমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে। কত যে তুমি আমাকে বকেছ এ নিয়ে তার হিসেব নেই।

"আচ্ছা তুমি বাঁ হাতটা ব্যবহার কর কেন?"—একদিন বিরক্ত হয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করলে।

"কেন আমার বাঁ হাতে কি?"

তোমার প্রশ্ন শুনে চমকে উঠেছিলাম।

সত্যি, এর আগে লক্ষ্যই করি নি যে বাঁ হাতটাই ব্যবহার করি বটে।

"সত্যি," আমি আমার ডান হাতটা তুললাম। "আশ্চর্য।"

"আশ্চর্য কেন?"

'কিন্তু আমার পক্ষে বাঁ হাত দেওয়াটাই যেন স্বাভাবিক মনে হয়।"

"ডান হাতটাই কাছে।"

"পিছন দিকে যে।"

"কিন্তু গলার সামনে দিয়ে হাতটা পিছনে এনে, তারপর ঘাড়ের পিছনে পৌঁছতে হয় তো!"

তুমি যা কিছু বলছিলে, তার সঙ্গে আমি যেন সহজে একমত হতে পারছিলাম না। কিন্তু তবু যখন তোমার কথার উত্তর দিচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল যে এই বাঁ হাতখানা এই জায়গায় আনতে গিয়ে আমি যেন নিজেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছিলাম। এ যেন নিজেকেই নিজে নিজে আলিঙ্গনের চেষ্টা। মনে মনে ভাবলাম, 'আমি ওর উপর নিষ্ঠুর হচ্ছি।"

চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, "বাঁ হাতটা ব্যবহার করতে ক্ষতি কি?"

"ডান হাতই হোক আর বাঁ হাতই হোক, অভ্যাসটা খারাপ।"

"জানি।"

"কতবার তোমাকে বলেছি, চল কোনো ডাক্তারের কাছে; ওটাকে কাটিয়ে ফেললেই হয়।"

"আমি পারব না। আমার লজ্জা করে।"

"এর আর কি?"

"একটা তিলের জন্যে আবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া!"

"বহু লোকই যায়।"

"মুখের মধ্যিখানে হলে না হয় হত। কিন্তু গলার মধ্যে একটা তিল, তার জন্যে আবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া। ডাক্তারও

হাসবে। ভাববে আমার স্বামীর বুঝি পছন্দ নয়, তাই।

"তুমি ডাক্তারকে বলো যে তোমার একটা অভ্যাস, ওটাকে নিয়ে খেলা করা ; সেই জন্যেই।"

"আচ্ছা, তিলের মতো সামান্য জিনিস—তাও আবার এমন জায়গায় যে দেখাই যায় না— এর জন্যে এত ব্যাপার কেন?"

"আমি তিলটা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না, যদি না তুমি ওটার পিছনে সব সময় পড়ে থাকতে।"

"কিন্তু আমি তা করতে চাই না।"

"কিন্তু তুমি যা একগুঁয়ে। আমি চিরকাল বললেও তোমার তো কোনো চেষ্টা নেই বদলাবার।"

"আমি চেষ্টা করি। এমন কি রাতে গলাবন্ধ জামা পরেও দেখেছি যাতে হাতটা ওখানে না পৌঁছতে পারে।"

"কিন্তু বেশিদিন নিশ্চয় তা কর নি।"

"হাত দিলে ক্ষতিটা কি?"— এবার আমিও যেন আবার পাল্টা আক্রমণ করবার চেষ্টা করলাম।

"এমন বিশেষ কি ক্ষতি আছে জানি না। তোমাকে এ অভ্যাসটা ছাড়তে বলছি, কারণ আমি এ পছন্দ করি না।"

"কিন্তু তোমার এত অপছন্দ কেন?"

"তা নিয়ে আলোচনা করার দরকার নেই। ওটাকে নিয়ে খেলা করার অভ্যাসটা খুব খারাপ। তাই আমার ইচ্ছা এ বদ অভ্যাসটা তুমি ছেড়ে দেবে।"

"আমি কি কখনো তা করবো না বলেছি?"

"যেই তুমি ওটাতে হাত দাও, তোমার মুখের চেহারাতেও কেমন যেন অদ্ভুত অন্যমনস্ক ভাব এসে যায়।"

বোধ হয় তুমি ঠিকই বলছিলে। তোমার এই কথাটা যেন সোজা আমার বুকের মধ্যে এসে বিঁধে গেল। আমার মাথা যেন সম্মতিতে নুয়ে এলো।

"এর পর আমাকে হাত দিতে দেখলে, আমার হাতে চড় লাগিয়ো। হাতে কেন গালেই মেরো।"

"আচ্ছা তোমার এর জন্যে দুঃখ হয় না? এত সামান্য একটা বদ অভ্যাস তুমি নিজের চেষ্টায় ছাড়তে পারছ না?"

আমি উত্তর দিলাম না। তুমি যে কথাটা এই মাত্র বললে আমি তারই কথা ভাবছিলাম।

ওই ভঙ্গিটা, বাঁ হাতটা গলার উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে, তিলটায় হাত দেওয়া, নিশ্চয় এমন কুৎসিত দেখায়। আর কেমন যেন সঙ্গীহীন একা। একাকীত্ব---এমন সুন্দর কথাটা এখানে ব্যবহার করতে আমার ইতস্তত লাগছে। একজন মেয়ে মানুষের পক্ষে নিজের ছোট্ট সত্বাটুকু নিয়ে স্বার্থপরের মতো থাকা—না, এর ক্ষমা নেই। তাছাড়া তুমি ঠিকই বলেছ: 'অদ্ভুত অন্যমনস্ক।'

হয়ত এইটাই একটা প্রমাণ যে আমাদের দুজনের মধ্যে কিছুটা ফাঁক থেকে গেছে। আমি নিজেকে উজাড় করে দিতে পারি নি। হয়ত আমার নিজের অন্তরতম মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন তিলটাতে হাত দিই। ওটাতে হাত দিলে ছোট বেলাকার মতো আমি যেন আমার নিজস্ব স্বপ্নলোকে চলে যাই।

কিন্তু নিশ্চয় তুমি আমার উপর আগে থেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলে, তা না হলে সামান্য একটা অভ্যাসের জন্যে এত কথা উঠত না। যদি তুমি খুশি থাকতে, তাহলে হয়ত এটাকে হেসে উড়িয়েই দিতে।

সেই ভাবনাটাই আমায় ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। আমি এই ভেবে অস্বস্তি বোধ করছিলাম যে এমন লোকও তো থাকতে পারে যার কাছে এই অভ্যাসটা মনে হবে অতি মনোরম।

আমার সন্দেহ নেই যে আমার ওপর তোমার যে ভালোবাসা, তা ছিল বলেই তুমি প্রথম ওটা লক্ষ্য করেছিলে। কিন্তু এমনি ছোট ছোট বিরক্তিই হয়ত বিবাহ বন্ধনের মাঝখানে তাদের শিকড় ঢুকিয়ে দেয়। সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতিতে কিছুই হয়ত যায় আসে না। হয়ত আবার এমন বহু দম্পতি আছে, যাদের মধ্যে সব জায়গায় গরমিল। অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে যারা সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলে, তারাই পরস্পরকে ভালোবাসে ; আর যাদের মধ্যে বিরোধ, তারা পরস্পরকে ঘৃণা করে, তাও নয়। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, তুমি যদি আমার ঐ ত্রুটি লক্ষ্য করতে, তা হলেই বোধ করি ভালো হত।

কিন্তু তুমি রেগে আমাকে মারতে এলে।

আমি কেঁদে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন আমাকে এভটা সহ্য করতে হল ? সামান্য একটা তিলেতে হাত দিয়েছি বলে ? "কি করে এ রোগ সারবে ?" তুমি যেন রাগে কাঁপতে লাগলে। আমি বুঝতে পারছিলাম তোমার অনুভূতির গভীরতা। তাই আমি কিছু মনে করি নি। অথচ অন্য কেউ শুনলে বলত, কি নিষ্ঠুর স্বামী। কিন্তু হঠাৎ তুমি আমাকে মারাতে, আমাদের দুজনের মনের ভাব যেন খুলে গেল!

"আমি ছাড়তে পারব না। আমার হাত দুটো বেঁধে রাখ।" আমার হাত দুখানা তোমার বুকের কাছে নিয়ে জড়ো করে ধরলাম তোমার

কাছে গভীর আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে।

খুশি হলাম তোমার দৃষ্টিতে। তুমি তাকিয়ে দেখছিলে বাঁধা হাত ছুখানি দিয়ে চুলটা মুখের উপর থেকে সরাতে চেষ্টা করছিলাম। এইবার বোধহয়,এতদিনকার অভ্যাসটা সারবে, আমি মনে মনে ভাবলাম।

কিন্তু বলা যায় না কি উদ্ভট চিন্তা আমার মনে জমা হত যদি তখন কেউ তিলের কথা উল্লেখ করত।

আচ্ছা, আমার ওপর তোমার শেষ অনুরাগটুকুও চলে গেল বলেই কি আবার অভ্যাসটা ফিরে এলো? তুমি কি এই কথাই বলতে চেয়েছিলে যে যা হয় করগে, আমি হাল ছেড়ে দিলাম। যখন আমি আবার হাত দিতাম, তুমি এমন ভাব করতে যেন দেখতেই পাওনি।

তারপর একটা অদ্ভূত ব্যাপার ঘটল। এত বকুনি, মার খেয়েও যা সারে নি,তা আপনি সেরে গেল। মারাত্মক ওষুধে যা সারে নি, তা সেরে গেল নিজে থেকে।

"জান, আমি আর তিলটা নিয়ে খেলা করি না।"—কথাটা এমন ভাবে বললাম যেন ব্যাপারটা আমি সেই মাত্র লক্ষ্য করেছি। তুমি তাকালে। কিন্তু যেন কোনো উৎসাহ নেই।

যদি তোমার উৎসাহই নেই, তবে কেন একদিন অতটা বাড়াবাড়ি করেছিলে—এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিল। আবার হয়ত তুমিও প্রশ্ন করতে চাইছিলে যে যদি অত সহজেই ছেড়ে দিতে পারলে অভ্যাসটা, তবে কেন এতদিন তা কর নি? কিন্তু তুমি কথাই বললে না।

যে অভ্যাসে কিছু যায় আসে না, যা বিষও নয় অমৃতও নয়, তা

নিয়ে যদি থাকতে হয় তো থাকো সারাদিন—এই কথাই যেন ফুটে উঠল তোমার চোখের দৃষ্টিতে। বিরক্ত লাগল। তোমার মনেও বিরক্তি জাগাবার চেষ্টায় ইচ্ছা হল আবার হাত দিই। কিন্তু হাত যেন নড়তে চাইল না।

নিজেকে বড় একা মনে হল। রাগও হল।

ভাবলাম, তুমি সামনে না থাকলে আবার হাত দেব। কিন্তু ব্যাপারটা যেন অতি নক্কারজনক মনে হতে লাগল ; হাত দিতে পারলাম না।

মেঝের দিকে তাকালাম। ঠোঁট কামড়ালাম।

"তোমার তিলটার কি হল ?"—কত অপেক্ষা করেছি তুমি হয়ত জিজ্ঞাসা করবে এইকথাটা। কিন্তু তিল কথাটা আমাদের কথা-বার্তা থেকে যেন বিদায় নিয়ে গেছে।

আর বুঝি সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু।

কেন যেদিন তুমি বকাবকি করেছিলে, সেদিন আমি একটা কিছু করে বসি নি ? আমি সত্যিই অপদার্থ।

বাড়িতে এসে, তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে, মার সঙ্গে আমি স্নান করছিলাম।

"সায়োকো তুমি আগে সুন্দর ছিলে, এখন আর তা নেই।" মা বললেন। "বয়সকে বোধহয় ঠেকিয়ে রাখা যায় না।"

আমি চমকে উঠে তাকালাম। মার যেমন মোটাসোটা আর নরম চামড়া ছিল, তেমনই আছে।

"তিলটাও তখন কত সুন্দর দেখাত।"

ওই তিলটার জন্যে আমি যে কত কষ্ট পেয়েছি, তা মাকে বলতে পারলাম না। শুধু বললাম, "ডাক্তারের পক্ষে ওটা কেটে বাদ

দিয়ে দেওয়া নাকি কিছুই নয়।"

"হ্যাঁ, তবে একটু দাগ থাকতে পারে।" আমার মা কি শান্ত।

"আমরা হাসতাম। সায়োকো হয়ত বিয়ের পরেও তিলটা নিয়ে খেলা করবে।"

"আমি করতাম।"

"আমরাও তাই ভেবেছিলাম।"

"অভ্যাসটা খুব খারাপ। কি করে শুরু হল?"

"যখন বাচ্ছাদের গায়ে তিল বার হয়।"

"আমার বাচ্ছাদের গায়ে তিল নেই।"

আমার আবার মনে পড়ল মা আর আমার বোনেরা তিলটা নিয়ে কত কি করেছে।

বাড়িতে তিলটা নিয়ে আমার খুশিমতো কত খেলা করেছি।

কোনো মানে হয় না।

তিলটায় হাত দিতে আমার চোখ জলে ভরে এলো।

কিন্তু হাত দেওয়া মাত্র তোমার কথাই মনে পড়ল।

স্ত্রী হিসাবে আমি অপদার্থ। হয়ত আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। বিছানায় শুয়ে শুধু তোমার কথা মনে পড়ল।

ভিজে বালিশে মাথা দিয়ে আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলাম সেই তিলটির। পিঠে হাত দিয়ে তিলটা আবার ধরতে গেছি, কিন্তু তিলটা যেন হাতে উঠে এলো—যেন সেইটাই স্বাভাবিক।

আমি যেন তিলটাহাতে নিয়ে তোমার নাকের পাশে যে তিলটা আছে, তার পাশে রেখে দিলাম। তোমাকে যেন দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছি।

যখন জেগে উঠলাম, তখনো আমার বালিশটা ভিজে। তখনো

কাঁদছি।

মনে হল আমি কত ক্লান্ত। তবু মনটা কতকটা শান্ত।

একবার মনে হল তিলটা কি সত্যি চলে গেছে? না যায় নি—হাত দিয়ে সেটাকে অনুভব করতে পারলাম।

তোমার নাকের পাশে যে তিলটা, সেটার কথা আমি কোনোদিন বলি নি। কিন্তু ওটার কথা সর্বক্ষণ আমার মনে ছিল।

কেমন সুন্দর একটা রূপকথা হত যদি আমার তিলটা তোমার তিলের উপর বসিয়ে দিয়ে দুটোকে একসঙ্গে আরো বড় করে দেওয়া যেত।

মাকে বললাম, "তোমার আমাকে বকা উচিত ছিল।"

"কত বকেছি।"

"কেন বকেছ?"

"কেন? ওটাতো খারাপ অভ্যাস।"

"যখন দেখলে আমি ওটাকে নিয়ে খেলা করছি তখন কি মনে হল?"

"কেমন যেন অশোভন।"

"তোমরা কি বিরক্ত হতে?"

হঠাৎ মনে হল সবাই আমার এই তিলটাকে কেন্দ্র করে আমাকে ভুল বুঝেছ।

আমার চরিত্রের যা কিছু কালিমা, তা হয়ত এই তিলটাকে কেন্দ্র করে। আমি যে উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারি নি তাও এই জন্যে।

এখন লিখতে গিয়েও মনে হচ্ছে আমার ত্রুটির কথা। কিন্তু তোমার কাছে এ কথা না বলে আমার উপায় নেই।

* "হোকুরোনো ডেগামী" গল্পের মূল অবলম্বনে।



পুনর্মিলন

যুদ্ধের শেষে ইউজো আৎসুগির জীবন যেন নতুন করে শুরু হল ফুজিকোর দেখা হয়েগিয়ে। কিংবা ঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, এ যেন নিজের সঙ্গেই মোকাবিলা।

বেঁচে থাকার যে বিস্ময়, সেটা সে বুঝতে পারল ফুজিকোর সঙ্গে দেখা হয়ে। শুধু বিস্ময়ই। এতে না আনন্দ, না দুঃখ। এমন কি দেখা হবার পর জীবন্ত মানুষ হিসাবে, কিংবা বস্তু হিসাবেও ফুজিকো প্রথমটায় ইউজোর মনে কোনো সাড়া জাগলো না। ইউজো নিজের অতীতের সঙ্গেই মোকাবিলা করছিল। তার অতীতটাই যেন ফুজিকোর চেহারায় বাস্তব হয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু সেই অতীতের

সমস্তটাই ইউজোর কাছে অবান্তর। ফুজিকোর স্পর্শে যদি আবার তা সত্য হয়ে ওঠে : ইউজো আশ্চর্য হয়ে দেখছিল যেন, অতীত আর বর্তমান তার চোখের সামনে মিশিয়ে এক হয়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধের কাজই হল অতীত থেকে বর্তমানকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। ইউজোর এই ধাঁধান বিস্ময়টুকুও যুদ্ধজাত। সে যেন ছিল যুদ্ধেতেই চোবান। মাথা তুলে দেখল অবাক হয়ে, ধ্বংস আর মৃত্যুর অগাধ বারিধি। কিন্তু তাও একটি পুরুষ আর একটি নারীর মধ্যে তুচ্ছ যেটুকু ছিল, তাকে যেন নষ্ট করে দিতে পারে নি। নিজে সে বেঁচে আছে আর ফুজিকোও বেঁচে আছে। এ যেন একটা আবিষ্কার। সে ভেবেছিল নিজের অতীত থেকে বুঝি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যেমন সে ফুজিকোর কাছে থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কোনো দায় না রেখে। ভেবেছিল বিস্মৃতিই তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। যুদ্ধের মাঝখান দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল বটে, কিন্তু জীবন ? তার জীবন ত ছিল মাত্র একটিই।

জাপানের আত্মসমর্পণের প্রায় মাস দুই হয়ে গেছে, যখন ইউজোর সঙ্গে ফুজিকোর দেখা হল। এখন সময়ও যেন মরে গেছে। লোকেরা তাদের ও জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে যেন এক বিভ্রান্ত কোলাহলে, ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দেখেছে। কারুর হয়ত বা মনে হচ্ছে, যেন সে পড়েছে এক পাগলা ঘূর্ণীর মধ্যে।
কামাকুরা স্টেশন থেকে বার হয়ে ইউজো ওয়াকামিয়া এ্যাভিনিউয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। বিশাল পাইনের সারি, মনে হল যেন বনস্পতির চূড়াগুলির মতো সে নিজেও সময়ের মধ্যে শান্তিতে

সমাহিত। বিধ্বস্ত টোকিওতে প্রকৃতির এই রূপ আর দেখা যায় না। যুদ্ধ বাধার পর থেকে দেশের হতাশার ক্ষতচিহ্নের মতো পাইন গাছগুলি শুকিয়ে মরে যাচ্ছিল। সারিবাঁধা এই গাছগুলি যা হোক বেঁচে আছে এখনও।

কামাকুরায় সুরুগাওকাহাচিমন মন্দিরেএকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবার কথা। এক বন্ধুর চিঠিতে এই খবর পেয়ে ইউজো এখানে এসেছিল। সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপারে এই অঞ্চলের একটা খ্যাতি ছিল। তা ছাড়া যুদ্ধ যখন শেষ হয়েই গিয়েছে, তাই এখন যুদ্ধ জয়কামী ভক্তবৃন্দের ভিড়ও মন্দিরে থাকবে না।

মন্দিরের অফিসের কাছে এসেই ইউজোর নজর পড়ল, লম্বা ঝোলান হাতাওয়ালা কয়েকটি তরুণীর উচ্ছলতার দিকে। এখনও যুদ্ধের সময়কার ইউনিফর্ম, কিংবা বিমান আক্রমণের পক্ষে উপযুক্ত সাধারণ জামা কাপড়ই বেশীর ভাগ লোকের পরনে। তাই লম্বা হাতার পোশাকগুলো যেন দেখাচ্ছিল ঝলমলে আর বেমানান।

দখলকারী সৈন্যদলেরও এখানে নিমন্ত্রণ ছিল। আমেরিকানদের চা পরিবেশন করার জন্য মেয়েরাও উপস্থিত ছিল। দখল নেবার পর, সৈন্যদের অনেকেই সবে মাত্র জাপানে এসেছে। হয়ত অনেকে এই প্রথম কিমনো দেখছে। তাই ছবি তোলার আগ্রহ ছিল অনেকেরই খুব বেশী।

মাত্র দু' তিন বছর আগে যে এই পোশাকই ছিল জাপানের জাতীয় পোশাক, এ কথা যেন আজ ইউজোর আর প্রায় বিশ্বাসই হয় না। খোলা জায়গায় চা-উৎসবের মেয়েগুলি। সঙ্গে আশপাশের দরিদ্র বেশবাস পরা লোকজনদের কেমন যেন বেমানান লাগছিল। মেয়েগুলির ঝকমকে পোশাকের চাকচিক্য যেন তাদের মুখে

চোখে, সমস্ত ব্যবহারের মধ্যেও প্রতিফলিত। আর তাই যেন ইউজোকে তার তন্দ্রা থেকে জাগিয়েতোলবারচেষ্টা করেছিল।

চা-উৎসবটা হচ্ছিল কয়েকটি গাছের ঝোপের তলায়। রং-না-করা, লম্বা কাঠের সরু টেবিল—যা যে কোনো মন্দিরে হামেশা দেখা যায়—সেই রকম একটি টেবিলের ধারে আমেরিকান সৈন্যরা দাঁড়িয়েছিল। তাদের চোখে মুখে নির্দোষ কৌতূহল। বছর দশে-কের হবে, ছোট মেয়েরা উৎসবের চা নিয়ে যাচ্ছিল। পোশাক, উৎসব, সব কিছু যেন ইউজোকে পুরান দিনের শিশু অভিনেত্রী-দের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

লম্বা হাতা জামা, যা বড় মেয়েদের মধ্যে একজনের পরনে ছিল, তা যেন ছিল সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে বেমানান। দেখে মনে হয়, মেয়েরা ভালো ঘরেরই মেয়ে। চালচলনে তাদের আভিজাত্য। কিন্তু ঝলমলে পোশাকে ইউজোর এখন মনে হচ্ছিল যেন তাদের শালীনতার অভাব। তার মনে হচ্ছিল যুদ্ধপূর্ব কালে তৈরি এই কিমনোগুলো ; কিন্তু যারা এখন সে কিমনো পরে ছিল তাদের রুচি কেমন নিম্নস্তরের। একটু পরে তাদের নাচের পোশাকে দেখে, এই কথাই যেন তার আরো বেশী করে মনে হল।

পুরাকালেও সাধারণ মেয়েদের পোশাকের এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না। কিন্তু নাচের পোশাকের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকত। এ কথা শুধু পোশাক সম্পর্কেই নয়, সমগ্র নারীত্ব সম্পর্কে বলা যায়। নারীত্বও আজ ক্ষুণ্ণ মর্যাদা। গাঢ় রংয়ের নাচের পোশাকে মর্যাদা না হোক, কিছুটা সৌন্দর্য অবশিষ্ট ছিল। মন্দিরের রঙ্গালয়ের স্টেজে নাচ হচ্ছিল। উরাইয়াসু নৃত্য, শিশি নৃত্য, গেন-

রোকু—পুষ্পদর্শন নৃত্য—এগুলি ইউজোর বুকে বাঁশির সুরে যেন বিগত, অন্তর্হিত স্পর্শ আনছিল।

একদিকার সংরক্ষিত আসন ছিল দখলদার সৈন্যবাহিনীর লোকেদের জন্য। ইউজো ছিল পশ্চিমদিকে ঐতিহাসিক জিনকো গাছের কাছে বসে। জিনকো গাছটাও যেন হলদে হয়ে গেছে। সংরক্ষিত আসনের বাইরে অতি ছিন্ন, ময়লা কাপড়জামা-পরা ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ময়লা, ছেঁড়া সাজপোশাকের শিশুগুলির পটভূমিকায়, মেয়েদের ঝকঝকে পোশাক দেখে কাদার উপর ফুলের মতো লাগছিল। সূর্য হেলে পড়েছিল গাছগুলির আড়ালে। স্টেজের খিলেনের লাল রংয়ের উপর আলো এসে পড়েছিল।

যে গণিকাটি পুষ্পদর্শন নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছিল, সে স্টেজ থেকে নেমে এসে তার সঙ্গিনীকে সঙ্গে না নিয়েই চলে গেল। ইউজো তাকে চলে যেতে দেখল। দেখে যেন কেমন বিষণ্ণ মনে হতে লাগল। গাঢ় রংয়ের রেশমী বসনের প্রান্তভাগ পাথরের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়াটা যেন দেখাচ্ছিল অপূর্ব সুন্দর। যেন এই দৃশ্য তার হৃদয়ে একই সঙ্গে জাগিয়ে তুলছিল উদাস বিষণ্ণতার সঙ্গে মেশা উগ্র কামনা।

মন্দিরের স্তব্ধতা যেন সব কিছুর পিছনে দাঁড়িয়ে একখানি সোনালী পর্দার মতো।

শিজাকু গেজেনের নৃত্যভঙ্গি ছিল প্রাচীন। কিন্তু পুষ্পদর্শন নৃত্যের মতো কোনো কিছুতে মুগ্ধ হবার মতো মনের অবস্থা ছিল না।

নাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ফুজিকোর মুখখানি তার নজরে পড়ল।

"না, না"—অবাক বিস্ময়ে যেন তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো।

মেয়েটাকে দেখে সে তার মনটা ইস্পাতের মতো শক্ত করার চেষ্টা করল। না, ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার মানেই হল আবার নানা বিপদ। কিন্তু ফুজিকো যে একজন জীবন্ত মানবী, আবার তার সঙ্গে দেখা হলে যে কি হতে পারে, তা ভালো করে অনুভব করবার ক্ষমতাও যেন তার ছিল না। তাই তার মনে কোনো অনুভূতি এলো না, এমন কি সে ফুজিকোর দিকে যে তাকাবে না, এও ভুলে গেল।

নৃত্যের পোশাকের সেলাইয়ের কথাটা, যা তার মাথার ভিতর ঘুরছিল, তাও যেন চলে গেল ফুজিকোকে দেখে। তবু ফুজিকো তার মনে কোনো দাগ কাটিতে পারে নি! মূর্চ্ছাহত ব্যক্তির দৃষ্টিতে যেমন হয় তেমন ফুজিকো শুধু চিত্রার্পিত হয়ে রইল তার দৃষ্টির সম্মুখে। যেন জীবন আর সময়ের স্রোতে সে চলেছে ভেসে। কিছুক্ষণ এমন থাকতে থাকতে, যেন একটা উষ্ণ অন্তরঙ্গতা, নিজেকে ফিরে পাবার মতো, অনুভব করল সে।

ইউজোর উপস্থিতির কথা বিন্দুমাত্র না জেনে, ফুজিকোও এক মনে নাচ দেখছিল। ইউজো তাকে চিনতে পেরেছে অথচ ফুজিকো যে তাকে লক্ষ্য করে নি, এটা ইউজোর অদ্ভুত লাগছিল। সব চেয়ে আশ্চর্য লাগছিল এই ভেবে যে তাদের মধ্যে দূরত্ব হয়ত মাত্র গজ কুড়ির, তবুও তারা কেউ কারুর উপস্থিতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সজাগ ছিল না।

হয়ত ফুজিকোর নিরাসক্ত উদাস চেহারাটার জন্যই, ইউজো আর কিছু না ভেবেই তার আসন ছেড়ে উঠে, ফুজিকোর স্বপ্ন ভাঙাবার জন্যই যেন হঠাৎ তার পিঠের উপরে হাত রাখল।

"ও!" ফুজিকো এমন ভাবে তাকাল, যা দেখে মনে হয় বুঝিবা

অজ্ঞান হয়ে সে পড়ে যাবে। কোনোমতে নিজের সম্বিত রেখে সে উঠে দাঁড়াল। ইউজো নিজের হাতে তা অনুভব করতে পারল।

"তা হলে তুমি ভালো আছ? আমি চমকে উঠেছিলাম! তুমি সত্যি ভালো আছ ত?" ফুজিকো শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল; বুঝি সে ফুজিকোর হাতেই অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

"তুমি কোথায় ছিলে?"

প্রশ্ন শুনে তার মনে হল, যুদ্ধের মধ্যে ইউজোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে কোথায় ছিল, তাই বুঝি ও জানতে চায়। মনে হল ইউজো বুঝি ফুজিকোর আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। মনে হল যে বহু বছর বাদে আবার নারীকণ্ঠ তার শ্রুতিগোচর হল। সে ভুলে গেল যে তারা রয়েছে ভীড়ের মধ্যে। তাদের প্রথম দেখা হবার অনুভূতি যেন ফিরে এলো তার মনে।

ইউজো যদি আবার এই মেয়েটির কাছাকাছি আসে, নৈতিক দিক থেকে যে সব প্রশ্ন ছিল, সেগুলি আবার উঠবে। তার স্বাভাবিক জীবনের এই সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত জটিলতাগুলিও আবার ফিরে আসবে। কিন্তু ইউজো ঠিক করল তার বাসনার নির্দেশে সে চলবে। তাই প্রথমটায় সাবধান হবার ইচ্ছাটা মনে এলেও সে আবার ফুজিকোকে পাবার জন্য, অতল গহ্বরে লাফ দিতেও প্রস্তুত হল। এই ধরনের কাজ বা চিন্তা হয়ত নির্বাণের জগতে বাস্তব। বাস্তববোধ বাধাও দূর করে। এতক্ষণ অতীতের সঙ্গে কোনো সংযোগই তার কাছে বাস্তবিক ছিল না। সে স্বপ্নেও ভাবে নি ফুজিকোর সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে যে নূতনত্বের মোহ ছিল,

তা আবার ফিরে আসতে পারে।

ফুজিকোর দিক থেকে কোনো অভিযোগ আছে বলে মনে হল না। সে বললে, "তুমি একটুও বদলাও নি।"

"সে কথা ঠিক না। আমি অনেক বদলে গেছি।"

"না, না, তুমি কিছুই বদলাও নি।"

ফুজিকোকে এত নিশ্চিত মনে হল যে ইউজো বললে, "হয়ত নয়।"

"এত দিন কি করছিলে ?

"যুদ্ধ করছিলাম।" ইউজো কথাগুলো যেন ছুঁড়ে মারছিল।

"মিথ্যুক। তোমাকে দেখে মনেই হয় না যে তুমি যুদ্ধে গিয়েছিলে।"

দর্শকদের মধ্যেও যেন শিহরণ লাগল। ফুজিকো সহজভাবেই হাসছিল। দর্শকরাও দুই নারীর এই আকস্মিক মিলন খুশী হয়েই লক্ষ্য করছিল। ফুজিকোও এই পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করল। ইউজো হঠাৎ যেন আত্মসচেতন হয়ে উঠল। ফুজিকোর পরিবর্তনগুলোও সে ভালো করে লক্ষ্য করল। কত মোটা ছিল সে, এখন কত রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু চোখ দুটি যেন আরও জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। প্রায় নির্লোম ভুরুদুটিকে ফুজিকো আগে ভুরুর পেনসিল দিয়ে কালো করে রাখত! কিন্তু এখন তার কোনো প্রসাধনই ছিল না, গালের গোলাপী আভা মিলিয়ে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। মোটের উপর তাকে অনেক সাদামাটা দেখাচ্ছিল। গলার উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল, তার রং যেন একটু ময়লা হয়ে গেছে। অমন সুন্দর চুলে বিনুনীও করা হল না। মাথাটাও যেন অনেক ছোট হয়ে গেছে। শুধু চোখ দুটি অনুভূতি-

ব্যক্ত।

ইউজোর মনে হল, তাদের বয়সের যে পার্থক্য এতদিন বেশী বলে মনে হত তার কাছে, তাও যেন হঠাৎ কমে গেছে। তাই আবার সে যেন যৌবনের স্বাভাবিক উত্তেজনা অনুভব করল।

"তুমি সত্যিই বদলাও নি," ফুজিকো আবার বলল।

ইউজোর পিছনে পিছনে ফুজিকো ভীড়ের পিছনের দিকে চলে গেল।

"তোমার স্ত্রীর খবর কি ?"

"উঁ ?"

"তোমার স্ত্রী ? ভালো আছে ত ?"

"হ্যাঁ।"

"বাচ্চারা ?"

"ওদের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"কোথায় ?"

"গাঁয়ের দিকে কফুতে।"

"তাই নাকি ? তোমার বাড়ি ?"

"বাড়িটা পুড়ে গেছে।"

"আহা ! জান আমিও পুড়ে গিয়েছিলাম ?"

"কোথায় ?"

"কেন, এই টোকিওতেই।"

'তুমি টোকিওতেই ছিলে ?"

"কি আর করব। আমি একা মেয়েমানুষ। যাবার বা থাকবার আর কোনো জায়গা ছিল না।"

হঠাৎ ইউজোর হাঁটু দুটোতে যেন ঠোকাঠুকি হয়ে গেল, যেন ঠাণ্ডায়

কাঁপছে।

"অবশ্য আমি এ কথা বলতে চাইছি না যে, মরার বাসনা থাকলে তুমি টোকিওতে শান্তিতে মরতে পারবে। যুদ্ধের মধ্যে তুমি কোথায় আছ, বাঁচার জন্য কি করেছ, তোমার পেশা, তোমার শিকড় আছে কি না, কিছুতেই কিছু যায় আসে না। আমার শরীর ভালোই ছিল, আর আমার অবস্থায় দুঃখ করবার মতো কোনো কারণ ঘটে নি।"

"তুমি বাড়ি ফিরে যাও নি ?"

"আমি আর বাড়ি ফিরে যেতে পারি কি ?"

তার প্রশ্নটায় যেন মনে হয় এর জন্য ইউজোই দায়ী। কিন্তু তার জন্য ফুজিকোর গলার স্বরে কোনো অভিযোগ নেই।

নিজের মূর্খতায় যেন ইউজোর আফসোস হতে লাগল। যেন একটা পুরান ক্ষত আবার ব্যথামুখর হয়ে উঠল। কিন্তু ফুজিকো তখনো তন্ময় হয়ে রয়েছে। ইউজোর ভয় হতে লাগল, বুঝিবা এটা কেটে যায়। নিজের ত্রুটিগুলোও আবার তার কাছে ধরা পড়তে লাগল যেন। যুদ্ধের মধ্যে সে সব নীতি বিসর্জন দিয়েছিল। ফুজিকোর কাছ থেকে সে যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পেরেছিল, এটা সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র যুদ্ধের বীভৎসতার জন্য। নরনারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে, যে সব ছোটখাট বিবেকের প্রশ্ন থাকে, তা এই যুদ্ধের ভয়াবহতায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

এখন এই অবস্থায় তার সঙ্গে দেখা হয়ে ইউজো শিউরে উঠল, ফুজিকো এই যুদ্ধের ভয়াবহ বীভৎসতা কি করে একা কাটিয়েছে তাই ভেবে। তার উপর কোনো অভিমান করবার মতো অবকাশও হয়ত ফুজিকোর ছিল না। মুখ দেখে মনে হয় তার আগেকার

হিস্টিরিয়াটাও হয়ত চলে গেছে। ইউজো সোজাসুজি চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না। ওর চোখগুলো যেন ভিজে ভিজে দেখাচ্ছে।

সংরক্ষিত আসনগুলোর কাছে ছেলেমেয়েদের মাঝখান দিয়ে জায়গা করে ইউজো মন্দিরের সিঁড়ির কাছে এলো। পাঁচ ছটি ধাপ উঠে সে বসে পড়ল। ফুজিকো দাঁড়িয়ে রইল।

"আজকাল তীর্থ করতে মন্দিরে আর কজন আসে? তবু দেখ এখানে কত ভীড়।" ফুজিকো কথাগুলো বললে পিছনে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে।

"তা বলে আজকাল মন্দির দেখলে ঢিলও ছোঁড়ে না কিন্তু।"

ভীড় জমে উঠছিল অনুষ্ঠানের জায়গাটি ঘিরে। মন্দিরের সিঁড়ির রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেল প্রায়। এরকম জায়গায় আমেরিকানদের উপস্থিতিতে গণিকাদের নৃত্যগীত হওয়ার কথা সেদিন পর্যন্ত ভাবা যেত না। মন্দিরের ওপাশে সার সার চেরী গাছ দাঁড়িয়ে। পাইনের পাতা ছুঁয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বুকের মাঝে ঢুকে ঠাণ্ডা লাগে।

"তবু ভালো, কামাকুরা এখনও তেমনি আছে। গাছ-পালা, দৃশ্য, ঠিক জাপানী ঢং। ঐ মেয়েগুলোকে দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম।"

"ঐ কিমনোগুলো কি রকম?"

"ঐ পরে ট্রামে ওঠা যায় না। আমিঐ রকম পোশাকে ট্রামে উঠেছিলাম," ফুজিকো ইউজোর দিকে তাকিয়ে একটু থামল, তার পর তার পাশে বসল। "ঐ কিমনো-পরা মেয়েগুলোকে দেখে মনে

হয় ভাগ্যিস আমি বেঁচে আছি! তারপর আবার ভাবলে মনে হয়, কেন এই উদ্দেশ্যহীন বাঁচা ? বড় হতাশ লাগে। জানি না আমার কি হয়েছে।"

"হ্যাঁ বুঝতে পারছি।" ইউজো আশ্চর্য হচ্ছিল।

ফুজিকোর গায়ের পোশাকটা নীল রংয়ের—দেখলে মনে হয় হয়ত বা কোনো পুরুষের পোশাক কেটে করা। ইউজোর ওরকম একটা পোশাক ছিল।

"তোমার স্ত্রী, বাড়ির সব কোফুতে, তুমি একা টোকিওতে আছ ?"

"হ্যাঁ।"

"অসুবিধা হচ্ছে না ?"

"হ্যাঁ, অসুবিধা ত এখন সকলেরই।"

"তোমার স্ত্রী ভালো আছে ?"

"হয়ত।"

"কিছু মনে করে নি ?"

"না।"

"মাঝে মাঝে বোমা পড়ার সময়ে আমার মনে হত, যদি তোমার স্ত্রীর কিছু হত, আর আমি বেঁচে থাকতাম ? কি বিশ্রী হত তা হলে ?"

ইউজো চমকে উঠল। ফুজিকো তরল গলায় বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল, "আমি যখন বিপদে পড়তাম, তখন জানি না কেন তোমার স্ত্রীর জন্য চিন্তা আসত মনে। বোকার মতোই। কিন্তু হত চিন্তা। ভাবতুম যুদ্ধ শেষ হলে তোমার সঙ্গে দেখা হলে, তোমাকে এ কথা বলব। মনে হত যদি বলি, তুমি কি বিশ্বাস করবে ? কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে প্রার্থনা করতাম অন্যের জন্য। নিজের কথাটা ভু.ল থাকতে

চাইতাম।”

কথাগুলো শুনে ইউজো নিজের কথাটাও ভাবতে লাগল। আত্ম-ত্যাগ ও স্বার্থপরতা, আত্মচিন্তা ও আত্মরতি, নীতি ও দুর্নীতি, আলস্য ও কর্মপ্রেরণা, যেন তার মধ্যেও একসঙ্গে মিশে গিয়েছে। হয়ত ফুজিকো যেমন একদিকে চেয়েছে, তার স্ত্রীর মৃত্যু, আবার তেমনি প্রার্থনাও করেছে তার মঙ্গলের জন্য। জীবনের এই দুই দিক, বুঝি যুদ্ধেতেই প্রকট হয়ে ওঠে।
ফুজিকোর সরু সরু চোখগুলি সজল হয়ে উঠল, তা দেখে বোঝা যায়, তার কথাগুলো সত্যি। আন্তরিকতায় ভরা। ‘আমি জানতাম, তোমার স্ত্রীর জন্য তোমার কতটা চিন্তা হবে, তাই আমিও তার কথা এত ভাবতাম।’
ফুজিকোর এত কথা শুনে, স্বভাবত ইউজোরও তার স্ত্রীর কথা মনে হল। আর সেই সঙ্গে যেন কিছু দ্বিধা। যুদ্ধের মধ্যে ইউজো তার পরিবারের যতটা কাছাকাছি এসেছিল, ততটা তার জীবনে আগে কখনো হয়ে ওঠে নি। বলা যায় ফুজিকোকে সে যতটা ভুলতে পেরেছিল, তার স্ত্রীকে সে ততটাই ভালোবাসতে পেরেছিল। কিন্তু যে মুহূর্তেই আবার ফুজিকোকে সে দেখলে, তার মনে হল, এ বুঝি তার আত্মার সঙ্গে পুনর্মিলন। যদিও স্ত্রীর কথা তার মনে পড়ল, তবু যেন একটা পাতলা পর্দা তাকে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ইউজোর নিজের মনের ক্লান্তি লক্ষ্য করে মনে হল সঙ্গি-নীর সঙ্গ-উন্মুখ পশু ছাড়া সে আর কি?

“সবে তোমার সঙ্গে দেখা হল, জানি না এখুনি তোমাকে একটা

কথা, যা ভাবছি, সেটা জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে কি না?" ফুজি-কোর গলার স্বরটা যেন ইউজোকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল। "কথাটা রাখবে ত ?"

অল্পক্ষণ নিস্তব্ধতার পর আবার বলল, "তোমায় আমার ভার নিতে হবে।"

"ভার মানে ?"

"কিছুদিনের জন্যে হলেও চলবে। অবশ্য আমি তোমাকে কোনো রকম জ্বালাব না।"

ইউজো কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, "এখন তোমার চলছে কি করে ?"

"খেতে যে পাচ্ছি না তা নয় কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন আবার শুরু করতে চাই।"

"শুরু বলো না বরং বল ফিরে যেতে চাও।"

"না ফিরে আসা ঠিক নয়। শুরুই একরকমের। তাতেই তোমার সাহায্য চাচ্ছি। আমি চলে যাব শীঘ্র। শুধু অল্প কিছুদিনের জন্য।"

এর কতটা সত্যি, ইউজোর পক্ষে তা বোঝা শক্ত মনে হল। হয়ত এটা একটা ফাঁদ ; আবার দয়া ভিক্ষাও বটে।

তার অতীত জীবনের একটি নারীর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গিয়ে, ইউজোর যেন আবার বাঁচার বাসনা ফিরে এলো। কিন্তু ফুজিকো তার এই দুর্বলতা টের পেয়ে গেছে কি ? না বললেও সে বুঝতে পারছে যে তাদের সম্পর্কটা আবার ঝালান যেতে পারে। কিন্তু ইউজো নিজে আবার এ-ও অনুভব করতে লাগল যে এমন কিছু ঘটেছে, যাতে তার অতীতের পাপ ও গ্লানি থেকে সে উপরে উঠে যেতে পারে ; তার নিজের এক সার্থকতার জীবনে। আত্মগ্লানিতে

সে চোখ নিচু করল।

হাততালি শোনা যাচ্ছিল। দখলদার সৈন্যবাহিনীর ব্যাণ্ড স্টেজের উপর উঠল। বাজনদারদের মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ।

আওয়াজ কানে যেতে ইউজো গভীর উত্তেজনা অনুভব করলে। যেন সে হঠাৎ জেগে উঠেছে। মাথার উপরে মেঘ কেটে গেছে। সেই সঙ্গীতের সুর যেন চাবুকের মতো তাকে আঘাত করল। ভীড়ের মুখগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য সে ভাবল আমেরিকা নিশ্চয় খুব খুশীর দেশ। আর সেই সঙ্গে যেন তার ঘুমন্ত পৌরুষ জেগে উঠল। এমন কি ফুজিকোর সম্বন্ধেও।

তখন তারা ইয়োকোমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হয়ে যেন তাদের অস্তিত্বটুকুও মুছে দিচ্ছিল। পোড়ার গন্ধ যা এতদিন ধরে যেন তাদের নাকে লেগে ছিল, তাও যেন চলে গেছে। ধ্বংসস্তূপের উপর ধুলো জমা হচ্ছিল। তার উপরেও যেন দেখা দিচ্ছে শরতের স্পর্শ।

ফুজিকোর সরু ভুরুর দিকে তাকিয়ে ইউজোর প্রত্যাসন্ন শীতের কথা মনে এলো। নিজের এত সমস্যার মধ্যেও তার এই ভেবে হাসি এলো যে সব বোঝার উপরে এই মেয়েটিও তার কাঁধে আর এক বোঝা। তাকে বইতে হবে। তবু এই ভেবে তার আশ্চর্য লাগল, যে পোড়া মাটিতেও দেখা যায় ঋতুর বর্ণবিন্যাস। সেই বিস্ময়ে যেন দায়িত্বের বোঝা হালকা করে নিতে পারল সে।

শিনাগাওয়া স্টেশন পার হয়ে গেল। এখানে তার নামার কথা ছিল। বয়স চল্লিশ পার হয়েছে, সে এই বয়সে দেখেছে মানুষের দুঃখ দুর্দশা সবই মিলিয়ে যায়। এমন কি প্রাকৃতিক দুর্যোগও মিলিয়ে যায়

প্রকৃতির কোলে। চেঁচামেচিই কর আর হাতদুটি জোড় করে স্রেফ বসে থাক,ফল সমানই। এমন করেই কি এইযুদ্ধটা এলো,আর গেল না ? হয়ত সে যা ভেবেছিল, তার চেয়ে তাড়াতাড়িই শেষ হয়েছে। এ রকম যুদ্ধের পক্ষে চার বছর বেশী না কম, এ মাপবার কোনো মাপকাঠিই ইউজোর কাছে নেই। তবু শেষ হয়েছে।

মনের গোপনে ইউজোর ইচ্ছা ছিল ফুজিকোকে ফেলে চলে যাবার, যেমন সে যুদ্ধের সময়ে অনুভব করেছিল। মাঝে মাঝে যেন এই ইচ্ছাটা মনের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। যুদ্ধটা ছিল ঝড়ের মতো। দুজন মানুষকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে তা ছিল যথেষ্ট। তার এই ভেবে ভালোও লেগেছিল যে তাতে অন্তত ব্যাপারটার একটা পরিসমাপ্তি ঘটবে। মাঝে মাঝে তার চরিত্রের স্বার্থপরতা বড় হয়ে উঠছিল, আবার কখনো সততা। ইউজো কিছু ঠিক করতে পারছিল না।

"আমরা এখন সিমবাসিতে," ফুজিকো ওকে যেন সতর্ক করে দিল।

"তুমিও কি টোকিও স্টেশনে যাচ্ছ ?"

"হ্যা।"

ফুজিকোর মনে পড়তে লাগল, এই স্টেশন থেকে তারা গিনজায় যেত। ইউজো বহুকাল গিনজার দিকে যায় নি। সিনাগাওয়া আর টোকিও স্টেশনের মধ্যেই আজকাল তার আনাগোনা।

"তুমি কোথায় যেতে চাও ?" ইউজো জিজ্ঞাসা করল।

"আমি ? কেন তুমি যেখানে যাবে ?" যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে ফুজিকো বললে।

"না প্রথমে চল তোমার বাসায়।"

"কিন্তু জায়গাটা ভালো নয়। কোনো মতে মাথা গুঁজে থাকার একটা জায়গা আর কি।"

"কিছু যায় আসে না।"

"এখন থেকে তোমার সঙ্গে যেখানে থাকা যাবে সেইখানেই থাকব।"

"কোথায় খাওয়া দাওয়া করছিলে?"

"খাওয়া আর বেশী পাচ্ছিলাম কোথা?"

"তোমার রেশন পাও কোথা?"

ইউজোর মুখ দেখে ফুজিকো বুঝতে পারছিল যে সে রাগ করছে। কিন্তু তবু সে উত্তর দিল না। ইউজো বুঝতে পারল যে, সে তার ঠিকানাটা জানাতে চায় না।

সিনাগাওয়া পার হয়ে গিয়েছে, এ কথা তার মনে পড়ল। একটু থেমে ইউজো বললে, "আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে থাকি এখানে।"

"ও, আর একজনের সঙ্গে?"

"হ্যাঁ। আমার এক বন্ধু ছ'খানা ঘরওয়ালা একটা জায়গা ভাড়া নিয়েছে, আমি সেখানেই একটু জায়গা করে নিয়েছি।"

"আর একটি লোক আমি সেখানে একটু জায়গা পাব না?" বোঝা যায় ফুজিকো যেন বদ্ধপরিকর।

টোকিও স্টেশনের প্ল্যাটফরমে ছ'জন রেডক্রস নার্স তাদের জিনিস পত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ইউজো প্ল্যাটফরমের আগাগোড়া লক্ষ্য করেও যুদ্ধ প্রত্যাগত কোনো সৈন্য নজরে পড়ল না। এই পথে যাওয়া আসা করতে যুদ্ধফেরৎ বহু সৈন্য তার নজরে পড়েছে। পৌঁছে তারা প্ল্যাটফরমের উপর লাইন করে দাঁড়ায়।

ইতিহাসে বোধ হয় এই যুদ্ধের কোনো তুলনা নেই। আর কখনো যুদ্ধে এত সৈন্য পিছনে ফেলে পশ্চাদপসরণ করার এতবড় ইতিহাস নেই। দক্ষিণ দ্বীপের পরিত্যক্ত সৈন্যরা টোকিও স্টেশনে পৌঁছল বুভুক্ষু দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অবস্থায়। যখনই ইউজোর চোখে এরা পড়েছে এক অস্বস্তিকর তিক্ততায় তার মন ভরে উঠেছে। কিন্তু আবার আত্মসমীক্ষার ইঙ্গিতও ছিল এতে। তাতে মনটা যেন ধুয়ে মুছে গেছে। পরাজিত দেশবাসীর সঙ্গে দেখা হলে সে মাথা উঁচু করেছে লজ্জায়। এই সৈন্যদের উপর আবার তার কেমন একটা সহানুভূতিও হত, যেন টোকিওর প্রতিবেশীদের তুলনায়, এরা কত অত্যাচারিত।

বহুদিন দুঃখকষ্ট সহ্য করার ছাপ মুখে, তাই যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈন্যদের মুখগুলি দেখায় যেন কেমন নিষ্পাপ মতো। দীর্ঘদিনের ক্লান্তি, ক্ষুধা, হতাশা, ফ্যাকাশে রং, বসা বসা চোখগুলো, সব কিছু জড়িয়ে যেন একটা অস্পষ্টত। সমস্ত জাপানী জাতির যে অবসাদ, তা বিদেশী কারুর পক্ষে বোঝা সহজ নয়।

রেড ক্রস নার্সরা দাঁড়িয়েছিল একটি স্ট্রেচারকে ঘিরে। একজন অসুস্থ সৈনিক প্ল্যাটফরমের উপর শুয়ে। ইউজো তাকে না মাড়িয়ে কোনো মতে পার হয়ে গেল। অসুস্থ সৈনিকটির দৃষ্টিও ভাষাহীন নয়। সে তাকিয়ে ছিল দখলকারী সৈন্যদের দিকে, যারা ট্রেনে উঠছে, নামছে। কিন্তু তার দৃষ্টিতে কোনো বিদ্বেষ ছিল না।

হঠাৎ একটা ইংরাজি কথা ইউজোর কানে গেল। কথাটা 'বড় গরীব'।

রেড ক্রস নার্সদের যেন বেশী সুন্দরী দেখাচ্ছিল। যুদ্ধের মধ্যে এমন মনে হত না। কে জানে হয়ত পারিপার্শ্বিকের জন্যই এটা

হয়ত মনে হচ্ছে।

ইউজো প্ল্যাটফরমের সিঁড়ি দিয়ে ইয়ায়েসুর দিকে বার হতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়ল, কয়েকজন কোরিয়ান তাঁবু ফেলে সেখানে আছে, যাতায়াতের রাস্তার উপরে। হঠাৎ সে বললে, "চল সামনের রাস্তা দিয়েই যাওয়া যাক। আমি বরাবরের অভ্যাস মতো পিছনের রাস্তায় এসে পড়েছিলাম।"

দেশে ফেরার ট্রেনের অপেক্ষায় অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করার চেয়ে, কোরিয়ানরা পথে বসে, তাদের জিনিসপত্র বার করে, দড়ি বাঁধা জিনিসপত্র খুলে রান্নাবান্না করার চেষ্টা করছে। এই ভাবেই তাদের রাত্রিও কাটাতে হয়। পরিবার, ছেলে, মেয়ে তাদের সঙ্গে, বাচ্ছাগুলোকে জাপানী বাচ্ছাদের থেকে তফাৎ করা যায় না। জাপানী মেয়ে বিয়ে করেছে যে সব কোরিয়ানরা, তাদের স্ত্রীরাও এদের মধ্যে ছিল। তারা তাদের নতুন স্বাধীন হওয়া দেশে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের দেখায় যেন গৃহহীন উদ্বাস্তুর মতো। যুদ্ধের ধাক্কা এদের উপর দিয়েও গেছে।

ইয়ায়েসুর দিকে বার হবার রাস্তায় ইউজো লম্বা লম্বা লাইন দেখতে পেত। এগুলো জাপানীদেরই। টিকিট কেনার লাইন। হয়ত পরের দিন সকালে ট্রেনের টিকিট দেবে, সারারাত এরা লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে কেউ হয়ত বসে আছে, কেউ একটু ঘুমিয়েও নিচ্ছে। মানুষের পায়খানা প্রস্রাবের গন্ধ। ইউজো চেষ্টা করত এ সব যাতে না দেখতে হয়, তার জন্য অন্য রাস্তা দিয়ে যেত।

এই দৃশ্যগুলোর কথা তার মনে পড়ল। তাই সে সামনের রাস্তা দিয়ে বার হতে চাইল।

গাছের পাতার শিরশিরিনির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সূর্যাস্তের

আলো। সূর্যকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে মুরানোর অফিসবাড়িটা। বাড়িখানার সামনে পৌঁছে তারা দেখল, ষোল-সতেরো বছরের নোংরা একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটার এক হাতে একটা সরু জারে কিছু গঁদ; আর এক হাতে একটা সরু পেনসিল। মেয়েটাকে দেখে মনে হয় সে ভিখারীই হয়ত। মাঝে মাঝে কোনো আমেরিকান সৈনিক গেলে, সে তাদের ডাকছিল, কি তাদের জামা ধরে টানছিল। কিন্তু কেউ তার দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছিল না। ইউজোর ভয় হল, হয়ত বা পাতলা আঠাটা সৈন্যদের মধ্যে কারো জামায় লেগে যেতে পারে।

তারপর একদিককার কাঁধটা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে, মেয়েটা স্টেশনের দিকেই চলে গেল।

"কি বিশ্রী!" ফুজিকো তাকাল।

"পাগল। আমি ভেবেছিলাম ভিখারী হবে বুঝি।"

"আজকাল ঐ রকম কিছু দেখলে, যেন আমার নিজের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকলে, আর আমার কোনো কিছুরই ভয় করে না। আমি যে মরে যাই নি, তাই ভেবে আনন্দ হচ্ছে। তাইত আবার তোমার সঙ্গে দেখা হল।"

"তাও বলতে পার। ভূমিকম্পের সময় আমি কান্দাতে একটা বাড়ির ভিতর আটকে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি ও মরে যেতাম।"

"জানি। তোমার কোমরের ডান দিকে একটা দাগ আছে। তুমি একবার বলেছিলে।"

"হ্যাঁ, তখন আমি স্কুলে পড়ি। তবে তখন জাপান পৃথিবীর চোখে অপরাধী ছিল না। সেটা ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়।"

"ভূমিকম্পের কথা আমার মনে নেই। কি হয়ত গাঁয়ে ছিলাম বলে ধাক্কাটা আমাদের উপরে পড়ে নি। তাই আমার মনে পড়ে না। আমার যদি ছেলে মেয়ে হয়, তবে আমার ইচ্ছা, জাপান একটু সামলালে তবে যেন তারা হয়।"

"একটু আগেই তুমি বলছিলে দুর্যোগের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে মানুষ শক্ত হয়। ভূমিকম্পের সময়ে আমি যে রকম মরণের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, এ যুদ্ধে তার তুলনায় কম। আজকালকার ছেলে মেয়েদের ত গায়ে আঁচড়টিও লাগে না। তাই তাদের মনে ভাবনা-চিন্তাও কম।"

'সত্যিই। তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর, আমার বার বার মনে হয়েছে যদি তুমি যুদ্ধে চলে যাও, আমার পেটে তোমার একটি ছেলে থাকলে কেমন হত। ফুজিকো তার কাছাকাছি এলো।

"জারজ সন্তান বলে ভবিষ্যতে কিছু থাকবে না।"

"কি বললে ?"

ইউজো কপাল কোঁচকাল। তার মনে হল হঠাৎ যেন একটা ভুল জায়গায় পদক্ষেপ করেছে। মাথাটা একটু ঘুরে উঠল যেন। কামাকুরাতে দেখা হয়ে যাবার পর থেকে তাদের কথাবার্তা যা হয়েছে সবই যেন একটু শুকনো আর উদাসীন।

বলা যায় না যে ইউজো যে কথা বললে তার মধ্যে স্বার্থ একেবারে ছিল না। কিন্তু নিজেকে এ ভাবে বিলিয়ে দেওয়া ? হয়ত এখনও স্বপ্নের ঘোর কাটে নি। কিন্তু ফুজিকোর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াটি ইউজোর কাছে যেন টাইট দড়ির উপর হাঁটার মতন।

আত্মসংযম রাখা যেখানেশক্ত। তার দিক থেকেও, এই সম্পর্কটি স্বীকার করার মধ্যে যে বিন্দুমাত্র স্বার্থের সংস্পর্শ ছিল না তাও নয়। কিন্তু শুধু কি আত্মতুষ্টি ? তার মনোভাবটা পুরোপুরি বাস্তব ব্যাপারেও উদ্বুদ্ধ নয়।

তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সকল নিয়ম কানুনের বাইরেই সে ফুজিকোকে গ্রহণ করেছিল। ফুজিকোও তার সত্তাকে অধিকার করে ছিল। তারপর যুদ্ধের বাস্তবের নিষ্ঠুর সমাধানে, সে যেন চলে গিয়েছিল আর এক স্বপ্নলোকে। এখনও তার যেন কেমন বুকচাপ ধরছিল। যুদ্ধের পূর্বে যে নারী তার জীবনে এসে পড়েছিল, যুদ্ধ-পরবর্তী জীবনে আবার সেই নারী। তার কাছে এসে পড়ায়, অতাতের যে শাস্তি ও বোঝা তার উপর এসে পড়তে পারে, সে কথাও তার মনে পড়ল। আবার সেই জন্যই তার ফুজিকোর উপর এক অসামান্য দরদে মন ভরে উঠল।

বড় রাস্তায় এসে হিবিয়া পার্ক, না কি গিনজার দিকে যাবে, তা সে ঠিক করতে পারল না। পার্কটার কাছে—কিন্তু এখন এ পার্কটা কত বদলে গেছে, সেই কথা ভেবে, সে গিনজার দিকেই চলতে শুরু করল।

ফুজিকো তার ঠিকানা প্রকাশ করে নি। তাই ইউজো সেখানে যাবার কথা তুলতে পারলে না। হয়ত সে একলা থাকে না। পোড়া পোড়া রাস্তা আর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেতে ফুজিকোও কোনো দ্বিধা করছিল না। কিন্তু ইউজোর আর ধৈর্য থাকছিল না।

সুকিজি অঞ্চলে এমন বাড়ি আছে, যেখানে তারা রাতটা কাটাতে পারে। কিন্তু ইউজো এ জায়গাগুলো ভালো চেনে না। তারা কাবুকি

থিয়েটারের কাছে এসে পড়ল। ফুজিকো তার পিছনে খুব ঘেঁষে চলতে লাগল। ইউজো বললে, "একটু দাঁড়াও।"

"আমার বড় ভয় করছে।"

ইউজো কনুই দিয়ে ওকে ঠেলা দিলে। ফুজিকো ওকে ধরে রইল।

হঠাৎ যেন পায়ে ভাঙা টালির হোঁচট খেয়ে ইউজো সামনের দেওয়া-লের উপর এসে পড়ল। কিন্তু দেওয়ালটা যেন মনে হল একখানা ভাঁজ করা পর্দার মতো। শুধু এই দেওয়ালটাই দাঁড়িয়ে আছে। সারা বাড়িটা পুড়ে গেছে।

ইউজো যেন চমকে উঠল। দুর্গন্ধ, পোড়া, অন্ধকার, সবই দাঁড়িয়ে, যেন দাঁত উচিয়ে। অন্ধকার বুঝি তাকে শুষে নিতে চায়।

ফুজিকো বললে, "আমি একবার ভেবেছিলাম, গাঁয়ে কোথাও চলে যাব। এমনি এক সন্ধ্যায় আমি উয়েনো স্টেশনে লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ আমার পিছনটা যেন ভিজে গেছে মনে হল।" যেন কথাটা বলতে বলতে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আবার বললে, "আমার পিছনে একটা লোক। আমি লাইন থেকে বেরিয়ে গেলাম।·· ওঃ আমার এমন ভয় করছিল।"

"লোকটা অসুস্থ।"

ইউজো বললে, "চল আমরা যাই।"

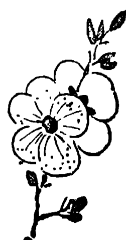
"হ্যাঁ, চল। কোন্ সকালে বার হয়েছি। মনে হচ্ছে বুঝি আমি মাটির তলায় ডুবে যাব।"

ফুজিকো চোখ বুজে ছিল। ইউজো তার দিকে তাকাল। হয়ত ওর সারাদিন খাওয়াই হয় নি। ইউজো বললে, "এই সব জায়গায় আবার ওরা বাড়ি তৈরি করবে।"

"আমি এ রকম জায়গায় থাকতে পারব না। হয়ত মাটির তলায়

কেউ শুয়ে রয়েছে। আমার এত ভয় করে।”
“সত্যি ; এখানের আবহাওয়া যেন বিষাক্ত।”

ইউজোর মনে হল সে ফুজিকোকে ফেলে পালাতে পারবে না। তার সারা মনে একটা নরম আত্মীয়তা তাকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। বহুদিন পরে আবার তার নতুন করে নারীস্পর্শ লাভ, যেন দীর্ঘ রোগভোগের পর।
তার হাড়ের নিচে যেন ফুজিকোর কাঁধটা কাঁপছে। তার স্তনভার ক্লান্তিতে নত। সব কিছুই এক নবজন্ম।
বাড়িগুলোতে জানলা, দরজা, মেঝে কিছুই ছিল না। চলতে গিয়ে পা বাড়াতে যেন পোড়া মাটির টুকরো পায়ের তলায় ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল।





প্রতিবিম্ব

একদিন কিয়োকোর মনে হল যে তার স্বামী, যে বিছানায় শুয়েই থাকে তার নিজের সবজীর বাগানটা দেখাবে, তার আয়নাতে। যে শয্যাশায়ী, তার কাছে এইটা যেন নিয়ে এলো নতুন জীবন। এই আয়নাখানা কিয়োকোর সাজগোজের সরঞ্জামের মধ্যে ছিল। পায়াগুলো বেশী বড় নয়। কাঠের তৈরি পায়াগুলো ; আর সেই কাঠেরই ফ্রেম। এই আয়নাখানাতেই তার মনে পড়ে, বিয়ের পর প্রথম প্রথম, বড় আয়নার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে, এই আয়নায় নিজের পিছনের চুলগুলো দেখতে গেলে, তার বাহুর পিছনটা উন্মুক্ত হয়ে গেলে, তার কি রকম লজ্জা করত।

চান করে এলে, তার স্বামী, আরশিখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, তার

ঘাড়ের পিছন দিকটা দেখাত ; একেবারে তন্নতন্ন করে। তার হাত থেকে আয়নাটা নিয়ে সে বলত "দেখত, কি রকম আনাড়ী তুমি। দাও আমি ভালো করে ধরছি।" হয়ত সে এই আয়নার মধ্যে নতুন কিছু খুঁজে পেয়েছিল। আনাড়ী না হলেও পিছন দিকটা কেউ দেখছে মনে হলে কিয়োকোর যেন কেমন অস্বস্তি লাগত।

কাঠের ফ্রেমের রং চটে যেতে বেশী সময় লাগে নি। ড্রয়ারেই ছিল ওটা। যুদ্ধ এলো। তারপর শহর ছাড়ার হুড়োহুড়ি। তার স্বামীর হল বাড়াবাড়ি অসুখ। যখন কিয়োকোর মনে হল ওটা দিয়ে তার স্বামী বাগানের প্রতিবিম্বটা অন্তত দেখতে পাবে ; তখন আরশিটা মুখের পাউডার আর ধূলো লেগে বিবর্ণ হয়ে গেছে। অবশ্য তার জন্য কিয়োকো কিছু মনে করে নি। তার স্বামীও আয়নাটাকে আব একবারও হাতছাড়া করে না। উত্থানশক্তি-রহিত বেচারীর সারাদিনের একমাত্র কাজ হয়ে উঠল আরশিটাকে পরিষ্কার করা। কিয়োকোর মাঝে মাঝে মনে হত--কে জানে হয়ত যক্ষ্মার জীবাণুগুলো আরশির খাজে খাঁজে থেকে গেছে কি না। স্বামীর মাথায় তেল দিয়ে আঁচড়ে দেবার সময়, কিয়োকোও তেলহাত দিয়ে আরশির কাঠের ফ্রেমটাতে মাখাত। তবে কাঠে ততটা চমক লাগল না ; যতটা লাগল কাঁচে।



কিয়োকোর আবার যখন বিয়ে হল, তখন এই আয়নার পায়া ও ফ্রেমটা সে নিজের কাছে রেখে দিল। আয়নাটা তার মৃত স্বামীর শবদেহের সঙ্গে পুড়ে গিয়েছিল। এখন ফ্রেমটাতে একটা নতুন আরশি পরিয়ে নিয়েছিল। অবশ্য তার দ্বিতীয় স্বামীকে এ সম্পর্কে সে কিছুই জানায় নি।

প্রথম স্বামী মারা যাবার পর তার জামার ভিতরে, তার বুকের উপর রেখেছিল।

"বুকে হয়ত তোমার লাগবে।"

কিয়োকো আরশিটা সরিয়ে পেটের উপর রাখল। তাদের বিবাহিত জীবনে এই আরশিখানার অবদান বড় অল্প ছিল না। তাই কারুর চোখে যাতে না পড়ে, তাই যেখানে আরশিখানা ছিল, তার উপরে সে চন্দ্রমল্লিকা ফুল স্তূপাকার করে দিল। কেউ জানতেও পারল না। সৎকারের শেষে, যখন ছাইগুলো কুড়োতে হয়, তখন লোকেরা দেখল, কিছুটা কালো কিছুটা হলদে, কি যেন একটা চকচক করছে। কেউকেউ বলল, "এটা যেন কাঁচ। কে জানে কি করে এলো।" আরশির ফ্রেমটাতে আর একটা ছোট আরশি কিয়োকো বসিয়ে নিয়েছিল। কিয়োকোর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু প্রথমবার বিয়ের পর তাদের মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব হয় নি। যুদ্ধের জন্য কোথায় যাওয়া তখন অসম্ভব ছিল। তার প্রথম স্বামীর জীবনে কোনো জায়গায় আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি, যেখানে এ আরশিটা কিয়োকো ব্যবহার করতে পারত।

দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে কিন্তু যাওয়া হল : প্রসাধন রাখার বাক্সটা পুরনো হয়ে গিয়েছিল। তাই সে আর একটা কিনে নিল। এটাতেও একটা আরশি ছিল।

প্রথম দিনই কিয়োকোর স্বামী ওর গায়ে হাত দিয়ে বললে, "তুমি ঠিক যেন ছোট মেয়ের মতো।" ওর কথাতে ছিল এক পরম সন্তোষ। কথাটা শুনে কিয়োকোর খুশী হবার কথা ছিল, কিন্তু তার বদলে ওর যেন বিষাদে মন ভরে গেল। ওর চোখ জলে ভরে উঠল। অবশ্য ওর স্বামীর কাছে এটা লাগল খুব ছেলেমানুষির মতো।

কিয়োকো বুঝতে পারল না তার চোখে জল এলো কি তার নিজের জন্যে? না কি তার পরলোকগত স্বামীর কথা ভেবে? আর এই ব্যাপারটা মনে করে তার বর্তমান স্বামীর জন্যও খুব দুঃখ লাগল। মনে হতে লাগল, তার সঙ্গে সে বুঝি ছলনা করেছে।

"আমি কি একটু অন্য রকম?" সে প্রশ্ন করল। কিন্তু প্রশ্নটি করেই সে যেন লজ্জায় মরে গেল।

খুশী খুশী মুখে তার স্বামী বলল, "তোমার এখনও ছেলেপিলে হয় নি—"

স্বামীর কথাটা যেন তার মর্মে এসে বিঁধল। তার পূর্ব স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের কাছে ঐ প্রশ্ন যেন তাকে লজ্জায় রাঙা করে তুলল।

"কিন্তু তা ছিল একটা বাচ্চাকে দেখাশোনা করার মতোই।" যেন প্রতিবাদের স্বরে সে বলল। যেন প্রথম স্বামী তার কাছে ছিল শিশুর মতোই। কিন্তু তাতে আর কতটুকুই বা লাভ হল? রোগীকে মারা যেতেই হলই।

"আমি মোরি শুধু ট্রেন থেকেই দেখেছি।" মোরি কিয়োকোর পৈত্রিক শহর। নামটা শুনে কিয়োকোর অবসাদগ্রস্ত মন যেন একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল। "নাম শুনে মনে হয় যেন বনভূমিতে ভরা

ছোট শহর। তোমরা কতদিন মোরিতে ছিলে ?"

"আমি হাই স্কুল থেকে পাশ করে বেরুনো পর্যন্ত। তারপর আমি সানজোর অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় কাজ করতে গেলাম।"

"সানজো কি মোরির কাছে না কি ? সানজোর মেয়েরা শুনেছি খুব সুন্দরী হয়। তাই তুমি বুঝি এত সুন্দরী।"

"যাঃ," কিয়োকো গলায় হাত দিয়ে ঢাকা দিল।

"তোমার হাতগুলি কত সুন্দর। তোমার সারা শরীরটাও ঠিক ওমনি সুন্দর হবে নিশ্চয়।"

কিয়োকো কিছু না বলে শুধু তার স্বামীর দৃষ্টির সামনে থেকে হাত দুখানি সরিয়ে নিতে চাইল।

"তোমার ছেলেমেয়ে থাকলেও আমি তোমাকে বিয়ে করতাম। অবশ্য মেয়ে হলেই ভালো হত।" আস্তে আস্তে সে বলল। হয়ত তার স্বামীর একটি ছেলে আছে বলেই এ কথা বলল। কথাটা একটু খাপছাড়া শোনাল। এই দশ দিনের মধুচন্দ্রিমার মধ্যে কিয়োকোর স্বামী চায় নি যে কিয়োকোর সঙ্গে তার সপত্নীপুত্রের দেখা হয়।



কিয়োকোর দ্বিতীয় স্বামীর যেহাতবাক্সটা, যার মধ্যে তার দাড়ি কামানর জিনিসপত্র ছিল, সেটা দেখে কিয়োকোর নিজের আগে-কার প্রসাধনের বাক্সটির কথা মনে পড়ল। তারই মধ্যে থাকত তার আরশিখানা, যেটা গেছে তার মৃত স্বামীর সঙ্গে।

সেই আরশিটা গলে গিয়েছিল কিন্তু এক কিয়োকো ছাড়া আর কেউ জানে না যে, সেই কাঁচের পিণ্ডটা কি ছিল।



কিয়োকোর মনে হল, যে জগৎ সেই আরশির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, তা যেন আগুনে নষ্ট হয়ে গেছে। ওটা যাওয়াতে কিয়ো-কোর তার স্বামীর দেহটা পুড়েছাই হয়ে যাবার জন্য যেমন দুঃখ বোধ হয়েছিল, তেমনি একটা দুঃখবোধ হয়েছিল। কারণ ওই আরশিতেই প্রথম তার সবজীর বাগানখানার প্রতিফলিত ছবি তার স্বামীকে কিয়োকো দেখিয়েছিল।

তার স্বামী সর্বদা আরশিখানা তার বালিশের তলায় রাখত।

কিয়োকোর স্বামী যে শুধু সবজীর বাগানখানাই এই আরশিতে দেখেছিল তা নয়। আকাশ, মেঘ, তুষার, দূরের পাহাড়, কাছের বন, আকাশের চাঁদ, বুনো ফুল, উড়ে যাওয়া পাখী, সব কিছুই এই দর্পণে ধরা দিয়েছিল। লোক হেঁটে গেছে রাস্তায়, এই আর-শিতেই, ছেলেরা খেলা করেছে।

আরশির জগতে যে কত বৈচিত্র্য তা দেখে কিয়োকোও আশ্চর্য হয়ে যেত একটি ছোট আয়না এই পঙ্গু মানুষটিকে যেন একটা নতুন জীবন এনে দিয়েছিল। পাশে বসে কিয়োকো এই আরশির জগৎ নিয়ে কত কথা বলত। যেন দুটি আলাদা জগৎ।

"আরশিতে দেখলে আকাশটা রূপালী দেখায়।" কিয়োকো বলল; তারপর জানলা দিয়ে তাকিয়ে আবার বলল, "অথচ আসলে আকাশের রং হল যাকে বলা যায় ধূসর।" আরশির আকাশ, আসল আকাশের চেয়ে হালকা। চকচকে।

"হয়ত তুমি আরশিটাকে সব সময় পালিশ করছ বলে।"

শুয়ে থাকলেও তার স্বামী ঘাড় ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তাকাতে পারে।

"হ্যাঁ কেমন পাঁশুটে মতন। কিন্তু আমাদের চোখে আকাশের যে রং কুকুর কি চড়াইপাখীর চোখে আকাশের রং অন্য রকম। কাজেই তুমি বলতে পারবে না, আসল রং কোন্‌টা।"

কিয়োকো এই আরশিখানাকে বলত তাদের ভালোবাসার চোখ। আরশিতে গাছগুলোকে দেখায় ঘন সবুজ, লিলিফুলগুলোকে আরও শুভ্র আর পবিত্র!

"এটা তোমার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ।"

আরশির এককোণে আঙুল দেখিয়ে সে বললে। কিয়োকো তাড়া-

তাড়ি সেটা মুছে দিল।
"কেন কিয়োকো বেশ ত ছিল। তুমি যেদিন প্রথম এই আরশি-খানা আমাকে দিলে,সেদিনও ওর ওপরে তোমার আঙুলের ছাপ ছিল।"
"কই আমি লক্ষ্য করি নি ত।"
"তোমার লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। আমি কিন্তু তোমার আঙুলের প্রতিটি রেখা পর্যন্ত মুখস্থ করে ফেলেছি। শুধু একজন পঙ্গুর পক্ষেই সম্ভব তার স্ত্রীর আঙুলের প্রতিটি রেখা পর্যন্ত মুখস্থ করে ফেলা।"



তাদের বিয়ের পর থেকে তার স্বামী বিছানাতেই শুয়ে থেকেছে। তাকে যুদ্ধে যেতে হয় নি। যুদ্ধের শেষের দিকে তাকে নাম লেখাতে হয়েছিল,কিন্তু এয়ারপোর্টে ডিউটিতে যোগ দেবার দিন কয়েকের মধ্যেই তার অসুখ করে গেল সে বাড়ি চলে এলো। প্রায় তারপর থেকেই সে উঠতে পারে না। কিয়োকো খবর পেয়ে তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে এলো। ও যুদ্ধে গেলে কিয়োকো বাপের বাড়িতেই

ছিল। বোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য ওদের শহর ছেড়ে যেতে হয়েছিল। বোমা পড়ে, যে বাড়িতে তাদের বিবাহিত জীবনের শুরু হয়েছিল, সেটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা কিয়োকোর এক বন্ধুর বাড়িতে একখানি ঘর ভাড়া নিল। তার স্বামী অসুখে পড়বার আগে মাত্র তিন মাস তারা একসঙ্গে ছিল।

ঠিক হল তারা পাহাড়ে ছোট বাড়ি ভাড়া নেবে, যেখানে জল হাওয়া ভালো। বাড়ির আর সকলে যুদ্ধ থেমে যেতে টোকিওতে ফিরে গেল। কিয়োকো একটি সবজীর বাগান করতে শুরু করল। হাত পনেরো একটা চৌকো জায়গা। আগাছা পরিষ্কার করে সেখানে বাগান লাগাল। সবজী কিনে চলে যেতে পারত ; কিন্তু কিয়োকোর ঝোঁক হল নিজের বাগানে সবজী ফলাবে। অবশ্য তার অসুস্থ স্বামীকে ফেলে যেতে হত নিচে মাঝে মাঝে ; কিন্তু বোনা বা সেলাই করতে বসলে তার যেন আরও মন খারাপ লাগত। বাগানের খোলাতে যেন কিছুটা ভরসা। এখানে তার স্বামীর উপর ভালোবাসটা যেন মনে হত কত বেশী। আর পড়া, যেটুকু পড়ত, চেঁচিয়ে পড়ে তার স্বামীকে শোনাত। দীর্ঘ শুশ্রূষার ক্লান্তি যেন কেটে যেত বাগানের কাজে।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তারা এসে পৌঁছল পাহাড়ে। গ্রীষ্মের অতিথিরা তখন চলে যাচ্ছে। শরতের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শীত।

সেদিনের আকাশটা ছিল যেন একটু বেশী রকমের স্বচ্ছ আর পরিষ্কার। পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছিল। দূরে পাহাড়ের দিকে কিয়োকো তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ কানে গেল তার স্বামীর গলা যেন তাকে ডাকছে। হাতে মাটি লাগা, কিয়োকো ছুটে উপরে এলো, দেখলে তার স্বামী হাঁপাচ্ছে।

"এত ডাকছি, তুমি শুনতে পাও নি ?"
"আমি একটুও শুনতে পাই নি।"
"বাগানে কাজ বন্ধ করে দাও। এত চেঁচাতে হলে আমি আর বাঁচব না। তা ছাড়া তুমি কোথায়, কি করছ তাও আমি দেখতে পাই না।"
"আমি বাগানে ছিলাম। বেশ তুমি বল ত বাগানের কাজ বন্ধ করে দেব।" ও শান্ত হল।
"পাপিয়ার ডাক শুনেছ ?"
এই কথা বলবার জন্যই ও ডাকছিল। কিয়োকো শুনেছে।
"একটা ঘণ্টা হলে ভালো হয়। আমি একটা ঘণ্টা এনে দেব। যত দিন ঘণ্টাটা না আসছে তুমি জানলা দিয়ে একটা কিছু ছুঁড়ে ফেলতে পার।"
"আমি বাটিটা ছুঁড়ব। বেশ মজা হবে না ?"

ঠিক হল কিয়োকো বাগানের কাজ করবে। এই সময়েই মাথায় এলো ওকে আরশি দিয়ে বাগানটা দেখানোর কথা।
আরশিটা তার কাছে এক সবুজের সজীব জগৎ নিয়ে এলো। পোকা দেখা যাবে না ভেবে, কিয়োকো সবজীর বাগানে যে সব পোকাগুলো মেরে ফেলত, সেগুলো দেখাবার জন্য উপরে নিয়ে আসত।
"*পোকাগুলো আমি এখান থেকেই দেখতে পাই।*" ও বলল। রৌদ্রের সময় কিয়োকো দেখতে পেত এক চিলতে আলো। দৃষ্টিতে তার অনুসরণ করলে দেখতে পেত, তার স্বামী আরশিতে রোদ ধরেছে।

ছাত্রজীবনে ওর যে নীল পায়জামাটা ছিল, সেটাকে কেটে কিয়োকোকে একটা কিমনো করে নিতে বলল। নীল, তাতে সাদার ছিট। এই কিমনোটা পরে কিয়োকো বাগানে কাজ করছে এটা ওর খুব ভালো লাগত আয়না দিয়ে দেখতে।

কেউ কিয়োকোকে লক্ষ্য করছে কি না, তার কোনো খেয়াল কিয়োকোর থাকত না।

এতদিন তার কেটেছে সেবা আর শোকে। এতদিন পরে, নতুন করে কিয়োকো লক্ষ্য করল যে সে সুন্দরী।

স্নানের পর আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আর তার ব্রীড়াবোধ জাগে না। আর যেন সেই দুই জগতের তফাতটাও নেই। আয়নায় দেখা তার নিজের চামড়ার রং যেন বাস্তব হয়ে উঠেছে। আকাশও। শুধু যেন দূরত্বের তফাৎ। পূর্ব স্বামীর জন্য তার মনটা কেমন বেদনায় ভরে উঠত। তবু আজ আর জানবার উপায় নেই, সে যখন বাগানে কাজ করত, তখন তার স্বামীকে আয়নায় কি রকম দেখাত।

কিয়োকোর জানতে ইচ্ছা করত কেমন তাকে দেখাত বাগানে কাজ করা অবস্থায়। শিশুরা খেলা করে বেড়াত, লিলি ফুলের ফোটা, সকালের সূর্যোদয়, এ সব কিছুর সঙ্গে সে ছিল যেন একাত্ম। তার বর্তমান স্বামীর কাছ থেকে, এ সব সে গোপন রেখেছিল। তার ভিতরে যে রূপহীন অণু-আকৃতি।

হঠাৎ একদিন সকালে কিয়োকো রেডিওতে শুনল, তার পূর্ব স্বামীর সঙ্গে যেখানে সে ছিল, সেই পাহাড়ে অঞ্চলের পাখীর গান। যেমন প্রায় তার অভ্যাসই হয়ে গিয়েছিল, তার স্বামী কাজে

বেরিয়ে গেলে সে আয়নার প্রতিবিম্বে আকাশ দেখত। সেদিন সে যেন একটা নতুন আবিষ্কার করল। দর্পণের প্রতিবিম্বে ছাড়া কেউ তার নিজের মুখ দেখতে পায় না। আচ্ছা সেইটাই কি তার সত্যিকারের চেহারা? এমন কেন হয়? মানুষ কেন তার নিজের মুখ দেখতে পায় না?

আচ্ছা নিজের মুখ নিজে দেখতে পেলে কি মানুষের আর মাথার ঠিক থাকত? আর পারত কি সে অভিনয় করতে?

হয়ত এইটাই মানুষের বিবর্তন। হয়ত ফড়িংরা নিজেদের মুখ দেখতে পায়।

মানুষের মুখ অন্যের দেখার জন্য! এইখানেই মিল ভালোবাসার সঙ্গে। আরশিটা রেখে দিতে দিতে কিয়োকোর মনে হল, এটা যেন একটা বাতায়ন। কিন্তু আবার মনে হল তার পূর্ব স্বামী আয়নায় তার মুখ দেখত। সে দেখা ত মৃত্যুকে দেখা। তবে কি আরশি দিয়েই কিয়োকো তার পূর্ব স্বামীকে হত্যা করেছে? তার পূর্ব স্বামী বলত "এটা আমি হাতছাড়া করব না।" তারা সেই আরশিতে চাঁদ দেখেছে বর্ষণের পরে।



"সবল জোরালো প্রেম থাকে শুধু সুস্থ মানুষের মনে।" তার দ্বিতীয় স্বামী এ কথা একদিন বললে। কিয়োকো যেন কথাটার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারল না। তার প্রথম স্বামীর স্মৃতি আজও জোরালো হয়ে আছে তার মনে। তার দ্বিতীয় স্বামী, নারীর প্রেমের মর্যাদার কতটুকু বোঝে ? সুস্থ জোরালো প্রেম ? তবে কেন তুমি তোমার প্রথমা স্ত্রীকে ত্যাগ করেছ ? কিয়োকো জিজ্ঞাসাও করেছিল। কোনো উত্তর পায় নি। কিয়োকো ওকে আবার বিয়ে করল তার পূর্ব স্বামীর দাদার পীড়াপীড়িতে। ও কিয়োকোর চেয়ে পনেরো বছরের বড়।

সন্তান-সম্ভাবনা হতেই কিয়োকো ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। "আমার ভীষণ ভয় করছে।" স্বামীকে ও জড়িয়ে ধরল, সকালে গা বমি বমি করতে সে যে কি রকম হয়ে গেল। খালি পায়ে সে বাগানে গেল। তার সপত্নীপুত্র স্কুলে গেছে, অস্বস্তি ; সারাদিন গভীর অস্বস্তি। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে সে চেয়ে রইল। মানুষের জীবন কত ভঙ্গুর ! হঠাৎ কিয়োকো হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। তার স্বামীর ঘুম ভেঙে গেল। সে ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। "তোমার গর্ভে যে সন্তান, তার কথা ভাব।" স্বামী বলল।

স্বামী ওকে শিশুর মতো দোলাতে লাগাল।

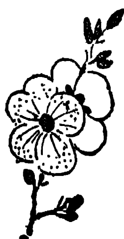
ডাক্তার বললেন, গোড়া থেকেই হাসপাতালে থাকতে হবে।

"হাসপাতালে যাবার আগে একবার বাড়ির সকলের সঙ্গে দেখা করে আসব।"

স্বামী নিজে সঙ্গে করে কিয়োকোকে তার বাপের বাড়ি নিয়ে গেল।

সেপ্টেম্বরের প্রথম। আর দিন দশেক আন্দাজ আগে সে হবে, সে তার প্রথম স্বামীর সঙ্গে—ওবছরে, এখানে এসেছিল। হঠাৎ ভীষণ গা বমি বমি করে উঠল। বুঝি বমি হয়ে যাবে। ইচ্ছা হতে লাগল ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে। পাহাড়ের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু আরাম বোধ হল যেন। তাকে শয়তানে পেয়ে বসেছিল। এই পাহাড়গুলো যেন এক নতুন জীবন্ত পৃথিবী। যে বাড়িটায় তারা থাকত, সেইটার দিকে সে তাকাল চোখের জল মুছে। জানলায় পরদা ঝুলছে অন্য কোনো লোকেরা এখন আছে। কিয়োকো তন্ময় হয়ে তাকাল।

"যদি বাচ্ছাটা তোমার মতো দেখতে হয়?" চমকে উঠে তার সম্বিত ফিরে এলো। এবার সে সত্যিকারের আরাম বোধ করল।





ইয়াসুনারী কাওয়াবাতা

কাওয়াবাতা ইয়াসুনারি জাপানী সাহিত্যে অতি পরিচিত নাম। চার বছর আগে একদিন কথাপ্রসঙ্গে, তখনকার জাপানী কন্সাল শ্রীশিগিহারা, ইয়াসুনারী কাওয়াবাতা সম্পর্কে বলেছিলেন যে ইনি একজন দিকপাল সাহিত্যিক। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ইনি নোবেল পুরস্কার পাবেন। তাঁর কথাটা সত্য হয়ে উঠল; ইয়াসুনারী কাওয়াবাতা ১৯৬৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন। অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা সুপরিচিত। আমেরিকার 'আটলান্টিক মান্থলিতে' যখন

তাঁর 'ইজু নর্তকী' গল্পটি অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাঙালী পাঠকদের কাছেও কাওয়াবাতা পরিচিত। আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৭ সালে 'শারদীয়া আন্তর্জাতি'কে ইয়াসুনারী কাওয়াবাতা "মিজু-সুকি" গল্পটি "প্রতিবিম্ব" নামে অনূদিত হয়েছিল। তাছাড়াও 'আধিব্যাধি' পত্রিকায় ওই বৎসর ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার "তিল" এই নামে আরও একটি গল্প অনূদিত হয়েছিল। কাওয়াবাতাকে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত করার দাবিটুকু বর্তমান লেখক করতে পারেন।

তাঁর জন্ম হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ওসাকা শহরে। তাঁর বাবা ছিলেন চিকিৎসক। কাওয়াবাতা যখন শিশু তখনই তিনি মা ও বাবা তু-জনকে হারান। আত্মীয়স্বজনদের কাছে তিনি বড় হয়ে ওঠেন।

যখন তাঁর ষোল বছর বয়স তখনই তিনি তাঁর মাতামহকে হারান। শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিকথা "জুরোকুশাই নো নেকি" অর্থাৎ কৈশোরের রোজনামচা বইখানিতে লিপিবদ্ধ।

স্কুল ও কলেজ জীবনেই তাঁর সাহিত্যানুরাগ প্রবল হয়ে ওঠে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে তিনি যখন টোকিওতে ছিলেন. তখনই তাঁর নানা অভিজ্ঞতা হয়। এইসব অভিজ্ঞতার কিছু কিছু পাওয়া যায় "ইজু নো ওদোরিকো" অর্থাৎ ইজু নর্তকী গল্পে।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে কাওয়াবাতা ইংরাজী ও জাপানী সাহিত্য পাঠ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার হয়ে তিনি বুনগেই সুনজু

পত্রিকার লেখক হিসাবে যোগ দেন। এই সময়ে তখনকার জাপানের দিকপাল সাহিত্যিকবৃন্দ, যেমন রাইনোসুকে আকুতাগাওয়া, কিংবা রীচি ইয়োকোমিৎসুদের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁদের সহ-যোগিতায় তিনি "বুনগাই জিদাই" বা শিল্পযুগ নামে একটি পত্রিকা বার করেন।

তাঁর ইজু নর্তকী গল্পটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি বার হতে দেখা গেল যেন এক নতুন ধরনের সংবেদনশীল, গভীর গদ্যভাষা তিনি সৃষ্টি করলেন। এর পর তাঁর পর পর কয়েকটি অনবদ্য গল্প প্রকাশিত হয়। এই গল্পগুলির মধ্যে "কিনজু"—পশু-পাখী, কিংবা "মাৎসুগু নো মে"—হতাশ যুগের দৃষ্টি গল্পগুলি পাঠক সমাজে সাড়া জাগায়।

১৯৩৭ সালে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "উকি-কুনি"—বরফের দেশ প্রকাশিত হয়। এই বইখানির জন্য তিনি বিখ্যাত হন।

যুদ্ধের মধ্যে কাওয়াবাতা খুব কমই লেখেন। যুদ্ধের পর আবার তাঁর লেখা দেখা যায়। সে লেখাগুলিও তেমনি অপূর্ব। এগুলির মধ্যে আছে "সিমবাজুরু"—হাজার সারস (১৯৪৭) "ইয়ামা নো ওটা"—পাহাড়ের বাণী (১৯৪৯) ; "সাহিকোনসা"—পুনর্বিবাহ (১৯৫৫) ও "মিজু উর্মি" হ্রদ (১৯৫৫)।

জাপানের সাহিত্যে যাতে কোনো ভেদনীতি না আসে তার জন্য কাওয়াবাতা সর্বদা সচেষ্ট। তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা "বুন-গাকুতেকি জিজোদেন"—আমার লেখকজীবন (১৯৩৪) বইটিতে এই মতবাদ তিনি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বাবামার মৃত্যু, জাপানের

ভূমিকম্প ইত্যাদির স্মৃতি এই লেখায় পাওয়া যায়। এই আত্ম-জীবনীর মধ্যে তিনি বলেছেন যে আমি ভুলতেপারি না,আমার গৃহহীন ছন্নছাড়া জীবন। আর এই হতাশায় ডোবা আমার মন স্বপ্ন দেখে কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যেতে যেন পারে না।

কাওয়াবাতার জীবন দর্শন,প্রেম ভালোবাসা। মালা গাথার সুতোর মতো ভালোবাসা জীবনকে ধরে রাখে তিনি বলেছেন। তাঁর কাছে সে ভালোবাসাও যেন হাওয়া কি জলের মতো,তাতে ওড়া যায়, সাঁতার দেওয়া যায়,নিজেকে সেখানে হারিয়ে ফেলা যায়।

যে উপন্যাসখানির জন্য কাওয়াবাতা অসামান্য খ্যাতির অধিকারী হন, সেটি একটি বর্ষীয়ান্ ভদ্রলোক ও একটি গাইসা মেয়ের ভালো-বাসার কাহিনী। উপন্যাসখানি "উকি কুনি" অর্থাৎ বরফের দেশ। জাপ সমুদ্রের কাছাকাছি তুষার রাজ্যে ট্রেনখানি টানেলের মধ্যে দিয়ে এসে প্রবেশ করল। সিমামুরা এই ট্রেনে আসছিলেন। শিমা-মুরা টোকিওর এক অর্থবান ভদ্রলোক। প্রচুর অবসর তাঁর জীবনে। নাচ গানের উৎসাহও প্রচুর। তিনি চলেছিলেন তাঁর অনেকদিন আগে দেখা এক সরাইখানায়।

পথে যেতে যেতে শিমামুরা ভাবছিলেন সেই মেয়েটির কথা। তার নাম কোমাকো। একে দেখতেই শিমামুরার এই দীর্ঘ যাত্রা। ট্রেনের জানলার ঝাপসা হয়ে যাওয়া জানলার কাঁচে শিমামুরা একবার হাত বুলিয়ে পরিষ্কার করে নিলেন। অন্ধকার হয়ে আসছে। বাইরের অন্ধকারে কাঁচটা যেন হয়ে উঠেছে আয়নার মতো।

সেই দর্পণে প্রতিফলিত দুটি চোখের উপর নজর পড়ল। করুণ চোখ একটি মেয়ের। যেন বহুদূরে জ্বলা দুটি প্রদীপের মতো সেই দৃষ্টি।

মেয়েটি তার পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছিল। কথায় কথায় শিমামুরা মেয়েটির নাম জানতে পারলেন—ইয়োকো। হয়ত ওরা স্বামী স্ত্রী। তবু শিমামুরার মনে হল মেয়েটি যেন স্পর্শের বাইরে তুষারের মতো অপাপবিদ্ধ, পবিত্র কুমারী।
ওরা মাঝের স্টেশনে নেমে গেল।

কোমাকোর সঙ্গে শিমামুরার দেখা হয়েছিল কিছুদিন আগে। পাহাড়ে বেড়াতে এসে তিনি এই সরাইখানায় ছিলেন। শিমামুরা একটি গাইসা মেয়েকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেদিন গ্রামের নতুন রাস্তাটি শেষ হয়েছে। রাতে ছিল সারা গাঁয়ে উৎসব। গাইসা মেয়েরা সকলে গিয়েছিল সেই উৎসবে।

সরাইখানার নৃত্য শিক্ষকের বাড়িতে থাকত কোমাকো। শিমামুরার কাছে তাই তাকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
এরকম সরাইখানায় এসে কোমাকোর মতো একজন নিষ্পাপ, সরল মেয়ের সঙ্গে দেখা হতে পারে শিমামুরার তা ধারণা ছিল না।

আবার পরদিন কোমাকো শিমামুরার ঘরে এলে, শিমামুরা তাকে অনুরোধ করে কোনো এক গাইসা মেয়েকে পাঠিয়ে দিতে।

গাইসা মেয়েটি এলে শিমামুরার মনে হয়, তার সঙ্গ যেন তার কাছে অসহ্য। কাজের অছিলা করে সে বার হয়ে যায়। ফেরার পথে আবার কোমাকোর সঙ্গে দেখা। মনে হয় বুঝি সে সারা জীবন ধরে এমনিই একজনকে খুঁজেছে।

সেই রাত্রে আবার কোমাকোর সঙ্গে শিমামুরার দেখা হয়। কোমাকো সেদিন গাইসা পার্টিতে প্রচুর মদ্যপান করেছিল। কিন্তু শিমামুরা বা কোমাকো তাদের সম্পর্ককে তবু দৈহিক প্রয়োজনের তুচ্ছতার উর্ধ্বে রাখতে পেরেছিল।

আবার অনেকদিন পরে দেখা। কোমাকো এখন পুরোপুরি গাইসা মেয়ে। ক্রমে শিমামুরা জানতে পারে যে গাইসা বৃত্তিতে কোমাকো যা উপার্জন করে, তার সবটাই সে পাঠায় যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত সেই তরুণটির চিকিৎসার জন্য স্যানাটোরিয়ামে।

এই তরুণটিকেই শিমামুরা দেখেছিল ইয়োকোর সঙ্গে ট্রেনে আসতে। এই তরুণটি ও ইয়োকো বাকদত্ত। এখানে ইয়োকোর সঙ্গে আবার শিমামুরার দেখা হয়। আবার মনে পড়ে সেই চোখ দুটি।

শিমামুরা টোকিওতে ফিরে যাবে ঠিক করে। কোমাকো তাকে স্টেশনে তুলে দিতে এসেছে। হঠাৎ ইয়োকো হন্তদন্ত হয়ে স্টেশনে এসে উপস্থিত হয়। সে এসে কোমাকোকে বলে স্যানাটোরিয়ামে সেই ছেলেটির অবস্থা খুব খারাপ। শিমামুরার ট্রেন এসে যায়।

আবার কয়েক বছর পরে শিমামুরা সেই সরাইখানায় ফিরে আসে। ফিরে এসে সে দেখে কোমাকো আজও তাকে ভুলতে পারে নি। শিমামুরার মনে হয় ইয়োকোকে।

হঠাৎ শিমামুরার নিজের সমস্ত অস্তিত্বটা অর্থহীন মনে হয়। মনে হয় তার সঙ্গে তুলনায় কোমাকোর বাঁচা কত গভীর, কত অর্থপূর্ণ হয়ত।

সেই রাতে হঠাৎ কাছেই আগুন লাগে। শিমামুরা ও কোমাকো ছুটে যায় বরফ ঢাকা পথের উপর দিয়ে। পোড়া বাড়িটা থেকে বার করে আনে একটি দগ্ধ মেয়েকে। ওরা ছুটে কাছে গিয়ে দেখে সে ইয়োকো।

মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তেও শিমামুরা দেখে সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি, যা প্রথম দিন প্রতিবিম্বে দেখেছিল সে। কোমাকো ইয়োকোর দেহটা নিজের কোলে টেনে নেয়। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাতে শিমামুরা আকাশের ছায়াপথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

লেখকের সংবেদনশীলতা কি গভীর তার পরিচয় দেবার জন্য গল্পটি উল্লেখ করলাম। জাপানীদের সংবেদনশীলতা বুঝি এমনি গভীর হয়। তাই জাপানীদের পক্ষে হারাকিরি করে আত্মহননের এত প্রবণতা। নোবেল পুরস্কার লাভের অল্পদিন পরে কাওয়াবাতাও আত্মহনন করেন।